পিতা শিবিরাজ্যাধিপতি মহারাজ সঞ্জ এবং মাতা মহারাজ্ঞী কুমতী এজন্য মহা উদ্বিগ্ন। কুমার সম্বন্ধে আরো আশ্চর্য্য এই যে, সে জন্মাবধিই পরিষ্কার কথা বলিতে পারে এবং দানে তাহার মহা আগ্রহ। কুমারকে সন্তুষ্ট অথচ গৃহাবদ্ধ রাখিবার জন্য মহারাজ তাহার জন্য কারুকার্য্যময় ধ্যান-গৃহ এবং দানশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। রাজকুমার এক শ্বেতহস্তী আরোহণ করিয়া প্রত্যহ এই দানশালায় স্বহস্তে গরীবদুঃখীকে অর্থ ও আহার্য্যাদি দান করিতে যাইতেন। এই শ্বেতহস্তীর বিশেষত্ব ছিল—সে যেখানে যাইত সেখানেই আশানুরূপ বৃষ্টিপাত হইত।

একবার কলিঙ্গরাজ্যে জলাভাবে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। কলিঙ্গরাজ কুমার বেস্সন্তরের হস্তীর সংবাদ পাইয়া এবং কুমারের দানে অদ্ভুত আগ্রহ জানিতে পারিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে কুমার সমীপে হস্তীটী যাচ্ঞা করিতে পাঠাইলেন। দানশালায় যাইবার পথে কুমার সমীপে তাহারা তাহাদের আবেদন জানাইল।—'ও হস্তীটি! আমার চক্ষুদুটি অথবা শরীরের রক্ত-মাংস চাহিলে তাহাও দিতে প্রস্তত।' এই বলিয়া কুমার তৎক্ষণাৎ হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন এবং দানের ফলস্বরূপে বুদ্ধত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়া হস্তীটি তাহাদিগকে সমর্পণ করিলেন।

এদিকে শিবিরাজ্যাধিবাসিগণ তাহাদের পরম হিতকারী হস্তীটির এইরূপে ভিন্নদেশে দানের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া রাজসকাশে কুমারের নির্ব্বাসন দাবী করিল। কুমার নিজের যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া বনগমনের উদ্যোগ করিলেন। তাঁহার পত্নী মাদ্রী দেবী তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য জেদ ধরিলেন। অবশেষে তিনি ইহাতে সম্মতি দিয়া পুত্র জলীয় ও কন্যা কৃষ্ণজিনাকে তাহাদের মাতামহীর নিকট রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পুত্রকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া দেহধারণ সম্ভব, মাদ্রী দেবী ইহা কল্পনাও করিতে পারিলেন না। শেষ মুহূর্ত্তে কৃষ্ণজিনা ও জলীয়কে সঙ্গে লওয়াই স্থির হইল।

দানবীর বেস্সন্তর বনগমন করিতেছেন এই সন্ধান পাইয়া, পথে এক লোভী ব্রাহ্মণ তাঁহাদের রথ ও অশ্ব চাহিয়া লইল। রথ ও অশ্ব সেই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া রাজকুমার তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যাকে লইয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথশ্রমে অনভ্যস্ত পদ প্রতি-পদেই বাধা পাইতে লাগিল। কিন্তু সে ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া তিনি ক্ষতবিক্ষতচরণে চলিতে লাগিলেন। প্রাসাদ-বাসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া দেবতারও নয়নে অশ্রু ঝরিল।

মাদ্রী দেবীর পিতা সংবাদ পাইয়া পুত্রী ও জামাতাকে স্বীয় রাজ্যে লইয়া যাইতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত প্রয়াসই বিফল হইল—বেস্সন্তর সত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। পত্নী ও পুত্রকন্যা সহ তিনি বঙ্ক-গিরিতে প্রস্থান করিলেন। শক্র বোধিসত্ত্বের বঙ্কগিরি অভিমুখে গমনবার্ত্তা পাইয়া পূর্ব্বেই বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে উক্ত গিরিতে দুইটি বাসোপযোগী গুহা প্রস্তত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। বেস্সন্তর পত্নী ও পুত্রকন্যাকে এক গুহায় বাস করিতে দিয়া নিজে অন্য গুহায় আশ্রয় লইলেন। দিনের বেলায় পুত্রকন্যাকে বেস্সন্তরের নিকট রাখিয়া মাদ্রী দেবী অরণ্যে ফলমূলান্বেষণে যাইতেন। বেস্সন্তর অধিকাংশ সময়ই ধ্যানধারণায় নিমগ্ন থাকিতেন। এই ভাবে দিন বেশ কাটিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু অধিকদিন এভাবে কাটিল না—একদিন মাদ্রী দেবীর অনুপস্থিতিতে এক বিকটাকৃতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ভৃত্য করিবার মানসে তাঁহার পুত্রকন্যা দুইটি প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া বেস্সন্তর প্রথমে মনে করিলেন যে, ইহারা মাদ্রী দেবীর প্রাণের প্রাণ; পুত্রকন্যা বিহনে তিনি কি করিয়া প্রাণধারণ করিবেন! কিন্তু অপর দিকে বুদ্ধত্ব—আপনার বলিতে যাহা কিছু, আপনার যথাসর্ব্বস্ব সেই নির্ম্মম যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি না দিলে তো সেই পরমপদ মিলিবে না! বেস্সন্তরের অন্তর ছিন্নবিছিন্ন হইতে লাগিল। তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া তীব্র ভৎর্সনার সুরে বলিল—'এই কি তুমি দানবীর! কাপুরুষ তুমি।' ব্রাহ্মণের ভৎসনাবাক্যে কুমার আত্মস্থ হইলেন। নিষ্ঠুর দৃঢ় সত্যের জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভের সঙ্কল্প করিয়া দানের নিয়মানুযায়ী ব্রাহ্মণের হস্তে জল ঢালিয়া দিলেন।

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ আর্ত্ত, ক্রন্দনরত ও যাইতে অনিচ্ছুক সেই শিশুদ্বয়কে বেত্রাঘাত করিতে করিতে টানিয়া লইয়া চলিল। বেস্সন্তর অবিচলিতচিত্তে অপলকনয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন। একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল—মাদ্রী দেবীর প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করি। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য; বেস্সন্তর তখনি নিজ চিত্ত সংযত করিয়া স্থির হইলেন। শিশুদিগকে এইভাবে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে যাইতে একস্থানে ব্রাহ্মণের পদস্খলিত হওয়ার সুযোগ পাইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিয়া বেস্সন্তরকে জড়াইয়া ধরিল। পুত্রকন্যারা তাহাদের রক্তাক্ত শরীরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া পিতার মুখপানে কাতরভাবে চাহিয়া রহিল। ভগ্নীর কোমল অঙ্গে এতাদৃশ নির্ম্মম অত্যাচার সহ্য হইবে না বলিয়া জলীয় কৃষ্ণজিনার মুক্তি প্রার্থনা করিল। বেস্সন্তর বিমূঢ়ের মত নির্ব্বাক ও নিশ্চল

হইয়া বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহার দুই চক্ষু নিমীলিত হইয়া আসিল। ক্রোধপ্রজ্বলিত ব্রাহ্মণ ইতিমধ্যে আসিয়া ভ্রাতাভগ্নীকে লতিকা দ্বারা একত্র বন্ধন করিয়া পশ্চাৎ হইতে বেত্রাঘাত করিতে করিতে লইয়া চলিল। বেস্‌সন্তর চক্ষু চাহিলেন, আর তাহা নিমীলিত হইল না। শিশুদ্বয়ের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি তাঁহার সেই দীপশিখার ন্যায় নিবাত নিস্পন্দ মূর্ত্তিকে নরাকৃতি পাষাণমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া বেস্‌সন্তর ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। গুহায় গমন করিয়া তিনি ধ্যানে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন।

ক্রমে সূর্য্য পশ্চিমাকাশে চলিয়া পড়িল। সন্ধ্যায় ঘন ঘোর ঘনাইয়া আসিল। বলাকাশ্রেণী তাহার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিয়া আকাশপথে দিগন্তের পানে ফিরিতে লাগিল। নিস্তব্ধ কাননভূমি ক্রমেই ঝিল্লিরবে মুখরিত হইয়া উঠিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রী দেবীও ফলমূল সহ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মাতৃহৃদয় আজ অজানা আশঙ্কায় উতলা, গতরাত্রির অশুভ স্বপ্ন মাঝে মাঝে মনে জাগিয়া তাঁহার উদ্বেগ দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছিল। বাহির হইতে কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া তিনি নিরতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত গুহায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু একি, গুহা যে শূন্য!—শিশুদ্বয় নাই! ছুটিয়া তিনি স্বামীর প্রকোষ্ঠে গেলেন, সেখানেও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। ব্যগ্র-আবেগে তিনি স্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—আমার পুত্রকন্যা! কোথায় তাহারা? বেস্‌সন্তর সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। একটু সংযত হইয়া মাতার প্রাণনাশ আশঙ্কায় বলিলেন—'তোমার বিলম্ব দেখিয়া বোধ করি তাহারা তোমায় খুঁজিতে গিয়াছে'। মাদ্রী দেবী এই কথা শুনিয়া উন্মত্তপ্রায় গুহা হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া চলিলেন,—অন্ধকার কাননপথে পুত্রকন্যাদের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে ছুটিলেন। কিন্তু কোথায় তাহারা! নিষ্ঠুর প্রতিধ্বনি বার বার ব্যঙ্গ করিয়া তাঁহার আকুল আহ্বানের উত্তর দিয়া যেন বলিতে লাগিল--নাই নাই তাহারা নাই। সেই কাননে পুত্রকন্যারা যেখানে যেখানে যাইত, যে যে স্থান তাহাদের প্রিয় ছিল, মাদ্রী দেবী সকল স্থানেই তাহাদের সন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। ক্ষোভে হতাশায় সন্তানশোকে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। পত্নীর বিলম্ব দেখিয়া বেস্‌সন্তর তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। বহুযত্নে সংজ্ঞাহীনার চেতনাসঞ্চার করিলেন। জ্ঞানসঞ্চার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন,—'আমার সন্তান, তারা কোথায়?' সন্তানশোকে বিহ্বলা মাতার এই আকুল প্রশ্নে বেস্‌সন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আন্দোলিত হইল। কষ্টসংযত-কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন,—'ভদ্রে, বুদ্ধত্বের আশায় আমি সন্তানদ্বয়কে জনৈক প্রার্থী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি'। স্বামীপ্রাণা মাদ্রী দেবী আর প্রশ্ন করিলেন না। প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি এই দুঃসহ বেদনা হৃদয় পাতিয়া বরিয়া লইলেন—স্বামীর বুদ্ধত্বলাভেচ্ছার অমর্য্যাদা তিনি করিলেন না।

স্বর্গ হইতে শক্র সমস্ত দেখিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, মাদ্রী দেবীর সেবা ব্যতীত ধ্যানপরায়ণ বোধিসত্ত্বের জীবনধারণ অসম্ভব। যদি কেহ মাদ্রীকে চাহিয়া লয়, তবে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা। ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া শক্র বেস্‌সন্তর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং পরিচারিকা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া মাদ্রীকে প্রার্থনা করিলেন। কাতরনয়নে বেস্‌সন্তর জায়ার তাপক্লিষ্ট মুখপানে চাহিলেন। মাদ্রী তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ইঙ্গিতে আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করিলেন এবং গমনোদ্যত হইয়া বেস্‌সন্তরকে বলিলেন—'মনে রাখিও, ইনি এখন হইতে আমার। এঁর উপর তোমার আর কোন অধিকার নাই। আমি আপাততঃ অন্যত্র যাইতেছি। আমি যত দিন ফিরিয়া না আসি ততদিন ইনি তোমার কাছেই থাকিবেন'। অতঃপর তিনি স্বরূপ প্রকাশ করিয়া বেস্‌সন্তরের দানে সমস্ত দেবগণের বিস্ময় ও আনন্দসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং আর সপ্তাহকাল মধ্যেই তাঁহার পিতামাতা লোকজন সহ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে আসিবেন জানাইয়া গেলেন।

এদিকে সেই নৃশংস ব্রাহ্মণ শিশুদুইটিকে তাড়না করিতে করিতে বহু যোজনান্তরে স্বগৃহে লইয়া গেল। হৃদয়বান দেবতা দুইজন পিতামাতার রূপধারণ করিয়া সুযোগ পাইলেই গোপনে শিশুদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। একদিন এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্মণ একান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভীত ব্রাহ্মণ পরদিনই শিশুদ্বয়কে তাহাদের পিতামহসমীপে ফিরাইয়া দিতে গেল। প্রতিদানে ধনরত্ন লাভ করিল সে প্রচুর, কিন্তু উপাদেয় আহার্য্যের লোভে অত্যধিক ভোজন করিয়া প্রাসাদ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই সে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

পৌত্রপৌত্রীকে পাইয়া পুত্র ও পুত্রবধূর জন্য রাজারাণীর শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে কলিঙ্গরাজের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় তিনি যথাসময়ে কুমারের শ্বেতহস্তী প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। সুতরাং কুমারকে ফিরাইয়া আনিতে শিবিরাজ্যের আর কাহারো আপত্তির

কারণ ছিল না। সদলবলে মহারাজ পুত্র ও পুত্রবধূকে বঙ্কগিরি হইতে ফিরাইয়া আনিতে চলিলেন। স্বজন-বর্গের মধ্যে ফিরিয়া যাইবেন ভাবিয়া বেস্সন্তর ও মাদ্রী দেবীর আনন আনন্দোদ্ভাসিত হইল। কিন্তু কলিঙ্গ-রাজের নিকট হইতে শ্বেতহস্তী ফিরাইয়া আনা হইয়াছে শুনিয়া লজ্জায়, ক্ষোভে, বিতৃষ্ণায় বেস্সন্তরের অন্তর ভরিয়া উঠিল; তাঁহার দীপ্ত বদন হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল। যখন শুনিলেন অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় কলিঙ্গরাজ স্বেচ্ছায় হস্তী প্রত্যর্পণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় হইতে এক গুরুভার নামিয়া গেল; তাঁহার প্রশান্ত মুখে আবার হাসির রেখা দেখিয়া সকলে পরম আহ্লাদিত হইল। মাদ্রী দেবী ব্যগ্র-আগ্রহে শিশুদ্বয়কে কোলে তুলিয়া লইলেন। সকলে রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। যথাসময়ে বেস্সন্তর সিংহাসনাধিরূঢ় হইলেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দান-পারমিতার চরম সাধনব্রত উদ্‌যাপিত করিয়া দেহান্তে বোধিসত্ত্ব তুষিত-স্বর্গে গমন করিলেন; এবং তথায় পুনঃ মর্ত্ত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত আত্মস্থ হইয়া রহিলেন।

জাগতিক নিয়মানুযায়ী যথাসময়ে জগতে বুদ্ধাবি-র্ভাবের প্রয়োজন হইল। অতৃপ্ত-মানবের শান্তিবিধান ও সত্যধর্ম্মের সংরক্ষণকল্পে সেই যুগের আদর্শ সদ্গুণাবলীর একটি ঘনীভূত জীবন্তবিগ্রহের মূর্ত্তবিকাশ আবশ্যক হইল। দশসহস্র সৌরজগতের সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া তুষিত-স্বর্গে অবস্থিত বোধিসত্ত্বকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন, কারণ তাঁহারই কেবল অদূর-ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভের কথা। স্থান-কাল বিবেচনা করিয়া তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ক্ষত্রিয় সমাজকেই তখন সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেখিতে পাইয়া তিনি শ্রেষ্ঠ শাক্যবংশে পূতচরিত্র রাজা শুদ্ধোদন ও সাধ্বী রাজ্ঞী মহামায়ার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ স্থির করিলেন।

নারী-নৃত্য।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ)

বর্ত্তমানে আর্টের নামে, সুকুমার শিল্পকলার দোহাই দিয়া নারীনৃত্যের সাদর আহ্বানে বাঙ্গালার তরুণসম্প্র-দায়ের কতকগুলি নরনারী মাতিয়া উঠিয়াছেন; তাই আজ সময়ে অসময়ে, অবসরে অনবসরে প্রকাশ্য রঙ্গ-মঞ্চের উজ্জ্বল প্রদীপের দীপ্ত আলোকে শত শত কাম-কামনাবিজড়িত কলুষিত দৃষ্টির সম্মুখে কতকগুলি ভদ্র-রমণী নৃত্যের চপলচরণ বিক্ষেপে শত শত যুবকের মানসরাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞীরূপে বৃত হইয়া আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছেন। দর্শকের সঘন করতালির মধ্যে উৎক্ষিপ্ত যবনিকার পুরোভাগে চপল হাস্যে, চটুল লাস্যে, সুমোহন নয়নভঙ্গীর অপরাজেয় ক্ষমতায় সমাগত জনমণ্ডলীর চিত্তবিনোদনই আজ সেই সকল নারীর জীবনের কাম্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে। নৃত্যগীতপটীয়সী হইয়া জনসমাজে সুখ্যাতি অর্জ্জনের স্রোত গোমুখীর গঙ্গাপ্রবাহের মত বিপুলবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—বাঙ্গালার তথাকথিত শিক্ষিতা রমণীকুলের মধ্য দিয়া; কে তাহার গতি রোধ করে?

এখন দেখা যাউক, এ উন্মাদনা এ উত্তেজনা এ আকুল দৃপ্ত বাসনা নারীজীবনের পক্ষে অনুকূল কি প্রতি-কূল, উন্নতিপথের সহায় কি ক্ষতিকারক, বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট বিধানের অনুসরণকারী কি বিরুদ্ধাচারী।

নৃত্যগীত যে সুকুমার শিল্পকলা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মানবের মনোবৃত্তিকে পরিতুষ্ট করিতে এই দুইটির ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং মানুষ সহজেই দুঃখাতিশয্যে অভিভূত হইয়া মানসিক শান্তিলাভের জন্য নৃত্যগীতের আশ্রয় গ্রহণ করে; সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই রাজা মহারাজা বাদ্‌সা প্রভৃতির মনোরঞ্জনের জন্য নৃত্যগীত-কুশলা রমণী নিযুক্ত থাকিত এবং এখনো অনেক স্থানে আছে; বিশেষতঃ নৃত্য পুরুষের চেয়ে নারী সহজে আয়ত্ত করিতে সক্ষম। কিন্তু ইহাও সঙ্গে সঙ্গে পরিদৃষ্ট হয় যে, ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য বিশেষ উৎকর্ষলাভ কোন যুগেই করে নাই, যদিও বেহুলা বা উত্তরার মত দু'একটি নারীর দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে; কিন্তু বাস্তবিকই যদি নৃত্য ভদ্রসমাজের উপযোগী হইত, তবে তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিকাশলাভ না করিবার হেতু কি? এমন কি গুপ্ত কারণ বর্ত্তমান, যাহার জন্য নারীনৃত্য ভদ্রসমাজে স্থান লাভ না করিয়া 'নটী' নামে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল?

কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, নারীনৃত্য ভদ্রসমাজের উপযোগী নহে; বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্যসভ্যতাগঠিত ভদ্রসমাজে নারীনৃত্য কোন কালে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই, যদিও বর্ত্তমানে বিদেশী আবহাওয়ায় নারীনৃত্যের বিপুল স্পন্দন সমাজের অঙ্গে অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে; কিন্তু উহা যে সুফলপ্রসূ হইবে না, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কেন না—

(১) নৃত্য সুকুমার শিল্প হইলেও এমন শিল্প নহে, যাহার চর্চ্চা না করিলে মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না বা অন্ন-বস্ত্র পাওয়া যায় না;—উহা বিলাসিতার উপকরণ মাত্র; সুতরাং সংযতচিত্তা বিলাস-ব্যসন-বিরহিতা আর্য্যরমণী বিলাসের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। আরও এক কথা, আজ যাহা

বিলাসিতা বলিয়া অনুভূত হয়, কাল তাহাই অভ্যাসবশে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায় এবং তখন সেই বিলাসিতার দ্রব্য না পাইলে মানসিক অশান্তিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে; নৃত্য সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য।

(২) রমণীজাতির স্বাভাবিক ভূষণ লজ্জা—যা তাহাকে দিন দিন মাধুরীমণ্ডিত করে, তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করে, সংসারের চোখে তাহার কমনীয়তার উৎকর্ষসম্পাদন করে; কিন্তু নৃত্য এই লজ্জাশীলতার হানিজনক। শ্যামপত্রপুঞ্জের অন্তরালে স্ফুটনোন্মুখী যূথিকার মত নারী স্বভাবসুলভ লজ্জার ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া মহীয়সী শোভা বিস্তার করে। আজ যদি হঠাৎ সেই লজ্জাশীলতা ভাঙ্গিয়া দিয়া নারীকে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে হাবভাব প্রদর্শন করিয়া লোকের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়, তবে তাহার সে শোভা ও কমনীয়তা দূরে পলায়ন করে; সামান্য রূপজ মোহে মানবহৃদয় একটু আকৃষ্ট হইলেও পরে আর সে নারীর কোন আকর্ষণ থাকে না। তখন তাহার জীবন একটা ব্যর্থতায় পূর্ণ আধিব্যাধিরূপে প্রকটিত হয়।

(৩) নৃত্য প্রেমের পথেও একনিষ্ঠতার হানিজনক। মনে করা যাউক, একটি যুবক ও যুবতী (বিবাহিত বা অবিবাহিত) একসঙ্গে বরাবর নৃত্য করে; উভয়ের অঙ্গে অঙ্গে স্পর্শ হওয়া স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য; এখন কে এমন মহাপুরুষ আছে, যাহার ভিন্ন প্রকৃতির অঙ্গস্পর্শে চিত্ত বিকৃত হয় না, বা মনে কুভাবের সঞ্চার হয় না? অনেকে বলেন—"Too much familiarity inhibits sex-consiousness." অর্থাৎ অত্যধিক মেলামেশায় যৌনবোধ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু একথার কোন স্বার্থকতা দেখা যায় না। কারণ, সূর্য্যের উত্তাপ ও মাখনের মধ্যে যতই ঘনিষ্ঠতা হউক না কেন, একে অন্যকে বিচলিত করিবেই; অগ্নির উত্তাপে লৌহ উত্তপ্ত হইবেই, বরফের শৈত্য অগ্নিতে আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র; সেইরূপ পুরুষ ও নারীর দৈহিক এমন কতকগুলি বিশেষত্ব বর্ত্তমান, যাহা চুম্বক ও লৌহের মত পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যদি কেহ বলেন যে, রমণীর সাহচর্য্যে তাঁহাদের চিত্ত স্থির থাকে, শত নৃত্যের মাঝখানেও তিনি অবিচলিত থাকেন, অঙ্গে অঙ্গে সংস্পর্শ তাঁহাকে টলাইতে পারে না, তবে আমি তাঁহাকে মিথ্যাবাদী না বলিলেও সত্যের অপলাপকারী বলিতে দ্বিধা বোধ করিব না; কারণ যাহা স্বাভাবিক, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া মানবের সাধ্যাতীত।

কাজেই যে রমণী অপর পুরুষের সঙ্গে নৃত্যে মশগুল হইল, সে তাহার স্বামীকে ঠিক একনিষ্ঠভাবে ভালবাসিতে সমর্থ কি? তাহার মন অন্য পুরুষে আসক্ত হইলে স্বামীর প্রতি উপেক্ষা আসা স্বাভাবিক; ফলে গৃহের নিরবচ্ছিন্ন শান্তিকল্পনা আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত।

আর যদি কোন কুমারী পরপুরুষের সঙ্গে নৃত্য করে, তবে সঙ্গীর প্রতি যে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইবে না, কে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে? বস্তুতঃ আকৃষ্ট হইবেই; কাজেই যদি সঙ্গীর সঙ্গে তাহার বিবাহ না হয়, তবে তাহার জীবন কোন্ পথে গমন করিবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখিবার বিষয় নয়? আর যদি সঙ্গীর সঙ্গেই বিবাহ হয়, তবেই যে তাহার জীবন শান্তিময় হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়? কারণ স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের সঙ্গে যদি কখনো নৃত্য করিতে হয়, তবে সেই নবাগতের প্রতি যে তাহার আকর্ষণ জন্মিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, নৃত্য গৃহসুখের ও একনিষ্ঠ প্রেমের প্রধান অন্তরায়; এবং সম্ভবতঃ সেইজন্যই নৃত্য ঘৃণিত ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া নিম্নশ্রেণীর নর্ত্তকীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে কোন সম্ভ্রান্ত লোক কোন নর্ত্তকীকে বিবাহ করেন না। যদিও ইংলণ্ডে ইহা চলে, তথাপি ইংলণ্ডের ঘরের খবর অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সেখানে গৃহসুখ বহু পরিবারেই বিরল।

অনেকে বলেন, আমাদের মা-বোনকে যেমন দেখি, যার সঙ্গে নৃত্য করিব তাহাকেও কি সে ভাবে দেখিতে পারি না? উত্তরে বলিতে চাই—প্রকৃতি বলিয়া দেয় তাহা সম্ভব নহে। মনু প্রকৃতির এই নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া বলিতে দ্বিধা করেন নাই যে, মা-বোনের সঙ্গেও একান্ত নির্জ্জনে বাস করিবে না "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ"। ভক্তবীর চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"দারুপ্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।"

সুতরাং নারীনৃত্য কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নহে।

আর এক কথা, যাঁহারা অপরকে মা-বোনের মত দেখার কথা বলেন, তাঁহারা নিজের মাকে আনিয়া প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করাইতে পারেন কি?

অনেকে বলেন, নৃত্য ব্যায়ামবিশেষ; কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু নৃত্যকালে যে ভাবে দেহচালনা করিতে হয়, তাহার সঙ্গে স্বাস্থ্যের বিশেষ যোগ থাকা সম্ভব নহে। স্বাস্থ্যের অনুকূলে অনুষ্ঠিত ব্যায়ামের জন্য অঙ্গচালনা নৃত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশেষতঃ ভগবান স্ত্রীলোককে গর্ভ প্রভৃতি যে সকল অবস্থার মধ্যে পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার পক্ষে নৃত্য বড়ই

প্রতিকূল—অনিষ্টকর। স্ত্রীলোকের পক্ষে সাংসারিক কর্ম্মসাধন অনেকটা ব্যায়ামের মত কার্য্যকর হয়।

সেদিন আমার জনৈক বন্ধু বলিতেছিলেন যে, নৃত্য জীবনশক্তির পরিচায়ক, প্রাণের লক্ষণ। যে জাতির ভিতর নৃত্য আছে, বুঝিতে হইবে সে জাতির মধ্যে প্রাণ আছে, সে জাতির মধ্যে বাঁচিয়া থাকার লক্ষণ বর্ত্তমান। শুধু নৃত্যই যদি প্রাণের লক্ষণ হয়, তবে সে প্রাণ প্রাণ নহে, তাহা জীবন্মৃত্যু। কারণ যে নৃত্য গৃহসুখকে চিরতরে বিদায় দিয়া একটা অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করে, যাহা বিলাসিতার কুহকদণ্ডস্পর্শে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করিয়া একটা পাশবপ্রবৃত্তির ঠুলি চোখে পরাইয়া দেয়, যাহা একনিষ্ঠ ভাবগরিমাময়ী ছায়া বিদূরিত করিয়া কামের মূর্ত্তিমূর্ত্তি জাগাইয়া তুলিবার সমধিক সম্ভাবনা রাখে, তাহাকে যদি জীবন বলিতে হয়, কান্ত কবি রজনীকান্তের ভাষায় বলি, তবে সে জীবন—

"মরণের লাগি' যেন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা।"

চারু শিল্পকলার ভিত্তিতে উদারদৃষ্টি লইয়া বিচারপূর্ব্বক নারীনৃত্য যে গার্হস্থ্যাশ্রমের ও একনিষ্ঠ দাম্পত্য প্রেমের হানিজনক, তাহা আমরা দেখিলাম; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার-আলোচনার এই সূক্ষ্ম পদ্ধতি ছাড়িয়া স্থূলতঃ কি ঘটিতেছে যদি তাহার অনুসন্ধান করি, তবে বঙ্গীয় পারিবারিক জীবনের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একান্ত হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। ধর্ম্ম ও নীতির দিক হইতে কিছু বলিতে গেলে এইসব চারু-কলাবাদীরা 'গোঁড়া' ও 'পবিত্রতাবাদী' বলিয়া উপহাস করিয়া সব উড়াইয়া দিতে চান; কিন্তু ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ যে নারীকেই কেন্দ্র করিয়া সর্ব্বত্র পরিবার গড়িয়া উঠে। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উদাসীন পুরুষকে স্নেহে ও প্রেমে সাহচর্য্যে ও সেবায় বাঁধিয়া পরিবার গড়িয়া তুলিবার মূল শক্তি ভগবান নারীর মাঝেই নিহিত রাখিয়াছেন। নারী তাই স্বভাবতই একনিষ্ঠা একমুখী, একক লইয়া একের সেবায় একের প্রেমে তন্ময় থাকিতে ভালবাসে। সব সমাজেই নারী তাই চিরদিন গৃহপরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী;—ঐ আসনই তাহার প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট গৌরবের আসন। সে কোনও দিন তাই আপন অধিকার ছাড়িয়া বহির্মুখীন জীবনের জন্য লোভ করে নাই। আজ পাশ্চাত্য জগৎ অংশতঃ সাম্য ও স্বাধীনতার ভ্রান্ত আদর্শে কুপথ অবলম্বন করিয়াছে; গৃহ-পরিবারের শান্ত ছায়ার আশ্রয় হইতে নারীকে সংসারের রৌদ্রতপ্ত বালুকাময় মরুকান্তারে টানিয়া আনিতেছে। ইতিমধ্যেই সেখানে তাহার কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে—পরিবার-বন্ধন নষ্ট হওয়ায় স্বাভাবিক আনন্দের উৎস রুদ্ধ হইয়া কৃত্রিম ও কুৎসিত আনন্দের পিপাসায় নর-নারী ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া মরিতেছে। আমরা চোখের সম্মুখে এই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াও কি মরণোন্মুখ পতঙ্গের মত ঐ আগুনেই ঝাঁপাইয়া পড়িব? সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মের শাসনহীন আমাদের মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতাকে আমরা আর কতদিন স্বাধীনতা ও শিল্পকলার মুখোস পরাইয়া আত্মপ্রতারক হইব? মানুষের প্রকৃতি বড় অদ্ভুত! সে কোন কু-কার্য্যের অনুষ্ঠানেও তাহার অনুকূল যুক্তি-তর্কের সৃষ্টি না করিয়া পারে না—তাহার মন তৃপ্তি পায় না। প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এই নারীনৃত্যের সমর্থনে তাই কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ইহা ধর্ম্মার্থে চাঁদা সংগ্রহ। এই যুক্তি যে কতদূর ভঙ্গুর, তাহা যাঁহারা বাঙ্গলার "গরু মেরে জুতা দান" প্রবাদের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন।

মোটের উপর, এই নারীনৃত্যের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই—বলিবার কিছুই নাই। পশ্চিম দেশের ভ্রান্ত স্ত্রীস্বাধীনতার বীজ আসিয়া বহুদিন হইতে বাঙ্গলার মাটীতে প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে তাহা অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অনুকূলতা—প্রথমতঃ একদল আভিজাত্যগর্ব্বী অর্থশালী লোকের অপরিণামদর্শী বালকের আগুন লইয়া খেলা করার মত ক্ষণিকের খেয়াল; দ্বিতীয়তঃ এই আর্থিক দুর্দ্দিনে, একশ্রেণী শ্রমভীরু বিলাসী লোকের অর্থোপার্জ্জনের এই সহজ পন্থার আবিষ্কার; তৃতীয়তঃ নরনারীর সেই বয়োধর্ম্ম, যাহা পরস্পরকে পরস্পরের অভিমুখে প্রতিনিয়তই আকর্ষণ করিতেছে। এই ত্রয়ীর সম্মিলনে পারিবারিক অধঃপাতের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা দিকে দিকে নারীর নৃত্য অভিনয় ও আবৃত্তির মধুর মূর্ত্তি ধরিয়া বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্র ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ইহার এই অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বত্র—সাময়িকে ও সভায় সুদৃঢ় প্রতিবাদ আবশ্যক।

ইহা যে কিরূপ সুফলপ্রসূ, তাহার সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। অবশ্য যখন কোন একটা মত প্রবল হইয়া উঠে, তখন হঠাৎ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে কেমন শঙ্কা ও সঙ্কোচ আসে; প্রতি পদে নিজেকে একান্ত একাকী ও অসহায় মনে হয়; কিন্তু সাহস করিয়া একবার পা বাড়াইতে পারিলে মুহূর্ত্তে ভগবানের সহায়-হস্ত নামিয়া আসিতে বিলম্ব হয় না। একটু পূর্ব্বে যাহাদিগকে প্রতিপক্ষ ভাবিয়া হতাশ হইয়াছিলাম, তাহারাই শেষে স্বপক্ষ হইয়া পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকে। আজ বঙ্গসাহিত্যের দুর্নীতি-আলোচনায় সবাই মুখর হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু বেশীদিনের কথা নহে,—সবাই দেখিয়াছে, কাহার ঘাড়ে সাতটা

মাথা যে ইহার বিরুদ্ধে একটা কথা বলে ! তার পরে যতীন্দ্রমোহনের "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" ও ক্ষিতীন্দ্রনাথের "আর্ট ও সাহিত্যের" অব্যবহিত অভ্যুদয়ে কেমন করিয়া যে স্রোত ফিরিতে আরম্ভ করিল, সে কথা ভাবিতেও আজ বিস্ময় লাগে।

তাই বলিতেছিলাম, পিছনের দিকে দলের দিকে না তাকাইয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে স্বয়ং সত্য ও সুনীতির প্রতি শ্রদ্ধালু হইলে অনুসরণকারীর অভাব হইবে না। জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ কৃষ্ণকুমার সাহেব সহিত তাঁহার 'সঞ্জীবনী'তে প্রথম হইতেই যে প্রতিবাদের সুর তুলিয়াছেন, ইতিমধ্যে নানাস্থানে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিতেছে। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই দুরাচার আর কদাপি নির্ব্বিবাদে বাঙ্গালার পারিবারিক জীবনের ধ্বংসসাধন করিতে পারিবে না।

উপসংহারে বলি, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, দেবত্ব কেহ কামনা করেন ; যদি গৃহসুখ কেহ চান, তবে নৃত্যের পরিবর্ত্তে মা-লক্ষ্মীগণকে উষার প্রথম বিকাশে পূর্ব্বগগনের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে, সায়াহ্নের গোধূলিমালায় প্রতীচ্য গগনে অস্তগামী রবিকিরণের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত-কণ্ঠে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া সমস্বরে গাহিতে শিক্ষা দিন—

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

দেখিবেন, সংসার শান্তিকুঞ্জরূপে ফুটিয়া উঠিবে ; কুটীরে কুটীরে অমৃতরসের-নির্ঝর-ধারা প্রবাহিত হইবে, হৃদয়ে হৃদয়ে মন্দাকিনীর পূত-প্রেম-প্রবাহ মালিন্য-কালিমা ধৌত করিয়া বহিতে থাকিবে।

—

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধীয় ইতিহাসের উপকরণ (২)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক বৈশাখ—মুখবন্ধে আছে "বিধিপূর্ব্বক "ব্রাহ্মধর্ম্ম"কে অবলম্বন"। রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষেপ-জীবনবৃত্তান্তে আছে—"পরে যখন ধর্ম্মবিচারে তাঁহার প্রতিবাদিরা পরাস্ত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের উপায় হইল, ১৭৫১ শকে (বর্ত্তমানে ১৮৫১ শক চলিতেছে) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার দ্বারা স্থাপিত হইল।" তৃতীয় প্রবন্ধ—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১৯ চৈত্র ১৮৬৮ শক"। তত্ত্ববোধিনী সভাবিষয়ক বিজ্ঞাপনে আছে "ব্রাহ্মসমাজের নিম্নগৃহে"।

জ্যৈষ্ঠমাস—বিজ্ঞাপন—* * * "ব্রাহ্মসমাজের নিম্নগৃহে"। উক্ত বিজ্ঞাপনে এই প্রস্তাব—"বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" এই বাক্য আছে তাহার পরিবর্ত্তে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই শব্দ হয়। আর একটী বিজ্ঞাপন—"ব্রাহ্মসমাজ" "ব্রাহ্মসমাজে" "ব্রাহ্মসমাজের" "ব্রাহ্মদিগের" "ব্রাহ্মেরা" এই সকল শব্দ আছে। আর একটী বিজ্ঞাপনে "মাসিক ব্রাহ্মসমাজ" মাসের প্রথম রবিবার প্রাতে সাত ঘণ্টায় হইবার কথা আছে।

আষাঢ় মাস—মাসিক সমাজের বিজ্ঞাপনে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দ আছে।

ভাদ্র মাস—"ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৯ শক।

আশ্বিন মাস—"বঙ্গভূমিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা" লিখিত হইয়াছে। "পরন্তু ১৭৩৫ শকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের ১৬ বৎসর পূর্ব্বে) রঙ্গপুর হইতে তিনি কলিকাতা নগরে আগমন পূর্ব্বক বিচার দ্বারা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ দ্বারা ব্রহ্মোপাসনারূপ সত্যধর্ম্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন।" ১৭৩৭ শকে রাজা মানিকতলার উদ্যানগৃহে আত্মীয়সভা স্থাপন করিলেন, কিয়ৎকাল পরে সেস্থান পরিবর্ত্ত হইয়া তাঁহার ষষ্ঠীতলার বাটীতে সভা হইত, তদনন্তর কতক দিবস তাঁহার সিমুলিয়াস্থিত ভবনে সভা হইয়া পুনর্ব্বার মানিকতলার উদ্যানে আরম্ভ হইয়াছিল।

"সায়াহ্নকালে আত্মীয়সভাতে (তখনও সভা "আত্মীয় সভা"ই ছিল, ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মসভা নাম হয় নাই, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়) বেদপাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত, কিন্তু বেদব্যাখ্যার নিয়ম তৎকালে ছিল না।" * * * "ইতিমধ্যে ১৭৩৯ শকে রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্ট বিচারালয়ে অভিযোগ করেন, ইহাতে তিনি প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত (এইখানে ১৭৪২ শক হইয়া গেল) বিব্রত থাকাতে * * * আত্মীয়সভা পর্য্যন্ত আর হইত না। পরন্তু তিনি সেই অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার সভা (আত্মীয় সভা) আরম্ভ করিলেন। রাজার কলিকাতাস্থ ভবনে সভারম্ভ হইলে পর প্রথমত শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্রের গৃহে এবং তদনন্তর ভূকৈলাসে শ্রীযুক্ত রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এক একবার ব্রাহ্মসমাজ হয়। ১৭৪১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত বেহারীলাল চৌবে আপনার তুলাবাজারের ব্রাহ্মসমাজ আহ্বান করেন তাহাতে শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত

দেব, রাজা রামমোহন রায়, রঘুরাম শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ এবং সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ধনবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।"

[এই অংশ বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, অন্তত ১৭৪২ শক পর্য্যন্ত রাজা রামমোহন রায়ের সভা আত্মীয়সভা নামেই চলিয়াছিল; কিন্তু সেই সময়েই বাহিরে যে সকল ব্রহ্মোপাসনা-সংক্রান্ত সভা-সমাজ হইত, সেগুলি ব্রাহ্মসমাজ নামেই চলিতে সুরু হইয়াছিল।]

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন যে খৃষ্টপন্থী মিশনরি উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেব রাজা কর্ত্তৃক ব্রহ্মপন্থী হইয়া ঐ বিষয়ে "হরকরা" আফিসের উপরে উপদেশ দিতেন। সেখানে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি উপস্থিত থাকিতেন। একদিন গৃহে ফিরিবার সময় প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি রাজাকে ধর্ম্মসাধনের জন্য নিজেদের একটী গৃহস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সেবিষয়ে সম্মতি দেওয়ায় "রাজা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রতি অত্যন্ত সত্বর ছিলেন" * * * "পরন্তু ঐ স্থান (শিমুলিয়া স্থিত একখণ্ড জমি) নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে যোড়াসাঁকোস্থিত শ্রীযুক্ত কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তৎকালে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত, তাহাতে প্রথমত দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, তদনন্তর শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন, অনন্তর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন, পরিশেষে ব্রহ্মসঙ্গীত হইয়া সমাজের কার্য্য সম্পন্ন হইত; কলিকাতাস্থ অনেকেই তথায় আগমন করিতেন। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ব্বাহক ছিলেন। পরন্তু সমাজের আয়বৃদ্ধি হইলে কলিকাতাস্থ বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের গৃহপ্রস্তুত হইয়া ১৭৫১ শকের ১১ মাঘ দিবসে তথায় উপাসনা আরম্ভ হইল।" "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার * * * কারণে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি * * * দ্বেষানল জ্বলিত হইল," * * * "এই কালে কৌমুদী নামে ব্রাহ্মসমাজের অধীন এক প্রকাশ্য পত্র প্রচার হইত।" "১৭৫২ শকে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ড দেশে যাত্রা করিতে মানস করিলেন।" * * * "১৭৫১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর, বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরি এবং রাধাপ্রসাদ রায় সমাজগৃহের বিশ্বস্ত হইলেন। ইহাতে সমাজের কোন কার্য্যের অন্যথা হয় নাই, কেবল শনিবারের পরিবর্ত্তে বুধবারে সমাজ হইবার নিয়ম তাঁহারা স্থির করিলেন।"

১৭৫৫ শকের আশ্বিন মাসে ইংলণ্ডে রাজা পরলোক গমন করেন। মাঘ মাসে তাহার সংবাদ আসে। "সমাজের জন্মদিবসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি ধন বিতরণ একাল পর্য্যন্ত নিয়মিতরূপে হইয়া আসিতেছিল, ১৭৫৫ শকে তাহা নিরস্ত হইল।" "ব্রাহ্মসমাজের এই ম্লান অবস্থা প্রায় দশ বৎসর ক্রমাগত রহিল। পরন্তু ১৭৬১ শকের আশ্বিন মাসে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আন্দোলন পুনর্ব্বার আরম্ভ হওয়াতে ১৭৬২ শকের মধ্যেই পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি অনেকেই যত্নবান হইলেন।" মাসিক সমাজের বিজ্ঞাপনে—"ব্রাহ্ম সমাজ"।

কার্ত্তিক সংখ্যা—"বেঙ্গল হরকরা" হইতে উদ্ধৃত—"Historical Sketch of Vedantism" প্রবন্ধে আছে—"The Brahmma Samaj of Calcutta was established in the year 1830, a year before the Rajuh's departure for Europe, and two years before his death". * এই স্থলে foot note আছে—"Here the writer has made a mistake; The Brahmma Samaj was established in the year 1828, two years before the Rajah's departure for Europe and five years before his death: Ed. T. P."

"The Tattwabodhini Sabha * * * was founded in the year 1839"

অগ্রহায়ণ-সংখ্যা—"তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবেন"।

পৌষসংখ্যা—(রাজা রামমোহন রায়) "এই কলিকাতা নগরে যোড়াসাঁকো পল্লীতে এক ব্রাহ্মসমাজ তিনি স্থাপন করিলেন।" "কালক্রমে ঐ ব্রাহ্মসমাজের এপ্রকার অবসন্নতা হইল।" "১৭৬১ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে তত্ত্ববোধিনী নাম্নী এই সভা স্থাপন করিলেন।" বিজ্ঞাপনে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দ আছে।

মাঘসংখ্যা—"কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" ২ পৌষ ১৭৬৯ শক।

১৭৭০ শক জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা—তত্ত্ববোধিনী সভার ১৭৬৯ শকের সাম্বৎসরিক বিবরণ, যাহা ২৬ বৈশাখে সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশনে বিবৃত হয়—"শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায় * * * নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠান জন্য বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ১৭৫১ শকে স্থাপন করিলেন।"

১৭৭২ শক মাঘসংখ্যা—"ব্রাহ্ম সমাজের ট্রস্টডীড" হেডিং দিয়া রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত আদিসমাজের ট্রষ্টডীড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে আছে—"১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের অষ্টম দিবসে * * * ব্রাহ্ম-

সমাজগৃহের ট্রষ্টি করিয়া তত্ত্বাবধারক করেন। ঐ • • • ট্রস্টডীড ইংরাজী ভাষাতে লিখিত • • • অবিকল প্রকাশ করা যাইতেছে।" • • • "Rammohan Ray of Manicktollah"

[মন্তব্য :—আমরা গত সংখ্যাতেই বলিয়াছি যে, আমরা পুরাতন পত্রিকার প্রবন্ধসকল নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব যে ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক সম্বন্ধে প্রকৃত ইতিহাসের উপকরণ কি? বর্ত্তমান সংখ্যায় ১৭৬৯—১৭৭২ এই চার বৎসরের পত্রিকায় যাহা পাওয়া গেল, তাহাই উদ্ধৃত হইল। উদ্ধৃত উপকরণ হইতে বুঝিতেছি যে, ১৭৬৯ শক অবধি ব্রাহ্মসমাজ "ব্রাহ্মসমাজ" বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। ১৭৬৯ শকে উক্ত হইয়াছে যে ১৭৫১ শকে অর্থাৎ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ১৭৬৯ শকে "বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম" স্থলে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নাম গৃহীত হয়। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন-সংখ্যায় দেখি যে, ১৭৩৫ শকে রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়া সত্যধর্ম্ম স্থাপনে অত্যন্ত উদ্যোগী হইলেন। তখন অবধি বিলাত যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রামমোহন রায় মানিকতলায় ছিলেন। ঐ শক অবধি তিনি মধ্যে কয়েক বৎসর বাদ দিয়া ১৭৪২ শক পর্য্যন্ত আত্মীয়সভা চালান। কিন্তু এই সভায় সম্ভবত বাহিরের ব্রহ্মোপাসনার অধিবেশনকে "ব্রাহ্মসমাজ" বলা হইত। ১৭৫০ শকে ভাদ্র মাসে কমলবসুর বাটিতে ব্রাহ্ম সমাজ অথবা ব্রাহ্মদিগের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষত কার্ত্তিক-সংখ্যায় বেঙ্গল হরকরা হইতে উদ্ধৃত অংশের সম্বন্ধে ফুটনোট যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, তখন সাধারণ ধারণা ছিল বটে যে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দেই উহার মূল বীজ সর্ব্বপ্রথম উপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন অবধি ১৭৫৫ শকে রামমোহন রায়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত উহার জন্মদিবসে ব্রাহ্মণ-বিদায় দেওয়া হইত]।—এই জন্মদিবস কবে—১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসে অথবা ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘে?

—

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

আড়ানা—একতালা।

সুন্দর প্রকাশ হে প্রিয় তব
সুন্দর তোমার হাতের লিখন
দেখি' দেখি' মোর প্রাণ
আর ফিরিতে চাহে না।
জাগিল আমার প্রাণের মাঝার
শত নব গান, শত নব তান—
দিনু অর্ঘ্য তোমার চরণেতে;—
ফিরায়ো না।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী

৩ ১´ ২ ৩ ।
II ণা ধণা। পা মজ্ঞা মা পা I ণা মা পা র্সা। -া -া ণা ণা। পা মজ্ঞা মা -া I
সু • ন্দ র • • প্র কা • শ হে • • প্রি য় ত ব • • •

১´ ২ ৩ ১´
I সা সা সা মা। মা মা মা পা। মা পা মজ্ঞা মা I ণা দা ণা পা।
সু ন্দ র তো মা র হা তে র লি খ ন দে খি দে খি

২ ৩ ১´ ২
। ণা মা পা পা। ণা পা না র্সা I ণপা ণপা না নর্সা। র্রা র্সা II
মো র প্রা ণ আ র ফি রি তেং • • চা হে • • না

```
 ১´              ২               ৩                ১´               ২
I মা পা পা ণপা। না না না র্সা। র্সা না র্সা র্সা I না র্রা র্সা র্রা। র্রা র্সা না র্সা।
  জা গি ল আ     মা র প্রা ণে    র মা ঝা র       শ ত ন ব          গা ন শ ত

 ৩               ১´                ২                 ৩
। ণপা না র্সা র্সা I  না র্সা র্মর্জ্জা র্মা।  র্রা র্রা র্সা র্সা।  মা পা না র্সা I
  ন ব তা ন         দি হু অ০ ০          ধ্য তো মা র         চ র ণে তে

 ১´                 ২
I নর্সা র্রা র্সা নর্সা। র্রা র্সা IIII
  কি০ ০ রা য়ো০ ০ না
```

ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

[ভারতীয় সাধনার উপর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ভারতের মুক্তি ও জগতের শান্তি সম্ভবপর নহে বলিয়া উহার প্রচারকল্পে ১২।১০ গোয়াবাগান ষ্ট্রীটে, একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ৮ই বৈশাখ রবিবার ৩০২, আপার সার্কুলার রোডে কাশীমবাজার রাজভবনে উক্ত সমিতির যে প্রারম্ভিক সভার অধিবেশন হয়, তাহার একখণ্ড বিবরণপত্র উক্ত সমিতির যুগল সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সত্যানন্দ গিরি ও শ্রীবিধুভূষণ দত্ত মহাশয় আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। জাতীয় শিক্ষার স্বরূপ অবধারণ বিষয়ে ঐ সভায় এসম্বন্ধে যাঁহারা উৎসাহশীল ও অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মতামত নির্দ্ধারণের জন্য কয়েকটী সাধারণ বিবেচ্য বিষয় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সম্পাদকদ্বয়ের অভিপ্রায় অনুসারে আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; এবং আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ উপাচার্য্য শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহার যে সুচিন্তিত উত্তর দিয়াছেন, নিম্নে তাহাও আমরা প্রকাশ করিলাম। এসম্বন্ধে পাঠকগণ যদি তাঁহাদের সুচিন্তিত অভিমত আমাদিগকে লিখিয়া জানান, আমরা সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

বিবেচ্য বিষয়ঃ—

(১) ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির (culture) স্বরূপ কি?

(২) বর্ত্তমান ভারতে নানারূপ প্রতিকূল ভাব ও অবস্থার মধ্যে ঐ সাধনা-নির্দ্দেশক কি ঐক্যসূত্র পাওয়া যাইতে পারে?

(৩) ঐ সাধনাকে মূল করিয়া এদেশে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে?

(৪) ঐ পদ্ধতির শিক্ষা-প্রণালী, শিক্ষালয়ের গঠন-বিধি, পাঠ-বিধি, শিক্ষণীয় বিষয় (অর্থকরী ও কার্য্যকী ইত্যাদি সহ) কিরূপ হওয়া উচিত?

(৫) বর্ত্তমান সময়ে এদেশে যে বিভিন্ন জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সংগঠিত হইয়াছে বা হইতেছে তাহাদের সকলকে লইয়া একত্রে একটী শিক্ষা-সঙ্ঘ সংগঠন করিয়া, অথবা তাহাদিগের পরস্পর পরস্পরের সহযোগে ও সাহচর্য্যে, দেশ মধ্যে একটী বিরাট জাতীয় শিক্ষায়তন কিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে?

(৬) অন্যান্য যাহা কিছু বলিবার থাকে।]

ভারতীয় সাধনামূলক শিক্ষাপ্রচার-কার্য্য-সমিতির প্রারম্ভিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সমিতি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী। ইঁহারা আমাদের নিকট হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে অভিমত চান, আমাদের অভিমত সংক্ষেপে নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। তাঁহাদের প্রথম বিবেচ্য বিষয় "ভারতীয় সাধনা বা সংস্কৃতির (culture) স্বরূপ কি?" আমাদের উত্তর এই যে, এদেশের সাধনার স্বরূপ হইতেছে ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে জলন্ত বিশ্বাস; নৈতিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা; ধর্ম্মসাধনের জন্য অকাতরে ব্যয়; সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, আত্মীয়-স্বজনের সেবা এবং পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি অবিচলিত ভক্তি; সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান, ঐহিক সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং বৈরাগ্যের ভাবকে জাগাইবার জন্য ব্যাকুলতা। এই সকল ও অন্যান্য অনুরূপ আদর্শ হইতে

আমরা দিন দিন বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছি। যাহা প্রকৃত মনুষ্যত্বের পরিচায়ক আমাদের দেশের সেই চিরন্তন ভাবধারা হইতে আমরা ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে সরিয়া দাঁড়াইতেছি। এই সকল ভাবকে অন্তরের ভিতরে জাগাইয়া তুলিবার প্রকৃত শিক্ষার অভাব ঘটিতেছে। আমাদিগকে বিলাসী ও স্বার্থভাবী করিয়া তুলিতেছে। উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ক্রিয়াকলাপে সাদর আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রাণ খুলিয়া মিলিয়া মিশিয়া পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যের ভাব ভুলিয়া যাইবার যে যথেষ্ট অবসর আসিত, তাহা দিন দিন বিরল হইয়া পড়িতেছে। তৎপরিবর্ত্তে বহুদিন হইতে অভূতপূর্ব্ব পার্থক্যের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। প্রত্যেক সমিতি প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী; কিন্তু তাহা একেবারে অসম্ভব। বর্ত্তমান শিক্ষার যে ত্রুটি আছে তাহার সংশোধন ও পরিপূরণের দায়ীত্ব, প্রতি পিতামাতার আত্মীয়স্বজনের ও ছাত্রগণের অভিভাবকদিগের উপরে ন্যস্ত। শিক্ষকমণ্ডলী যদি ছাত্রবর্গের চরিত্রগঠনে ভারতীয় বিশেষত্ব নিজে উপলব্ধি করিয়া পরে উহা ছাত্রবর্গের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিবার প্রয়াস পান, আরও সুফল ফলিতে পারে। দুঃখের সহিত বলিতে হইবে বিদ্যালয়ের ও কলেজের শিক্ষকগণ বা অধ্যাপকগণ অনেক সময়ে এই ভারতীয় বিশেষত্ব স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টা করেন না, অপরকে শিক্ষা দিবেন—সে ত দূরের কথা।

২। "বর্ত্তমান ভারতে নানারূপ প্রতিকূল ভাব ও অবস্থার মধ্যে ঐ সাধনানির্দ্দেশক কি ঐক্য সূত্র পাওয়া যাইতে পারে?" উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রকৃত ধর্ম্মভাব সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাগিয়া উঠে, নিরবচ্ছিন্ন গুরু-পুরোহিত মোল্লা-ধর্ম্মযাজকের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরের পরিবর্ত্তে যদি আমরা ব্যক্তিগত ভাবে নিজ নিজ ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করিতে পারি এবং নিরবচ্ছিন্ন শাস্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে শিক্ষা করি, এবং উদার দৃষ্টিতে অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, ধর্ম্মের বহিরাবরণের ও কোন কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইলেও, প্রতি ধর্ম্মের মূল কথার মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। ঐ ঐক্যের উপরে যদি প্রতি সম্প্রদায় অধিক মাত্রায় জোর দেন এবং পার্থক্য লইয়া বৃথা তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে প্রতিকূল ভাব ও অবস্থার মধ্যে ঐ সাধনানির্দ্দেশক যথেষ্ট ঐক্যসূত্র পাওয়া যাইতে পারে।

৩। "ঐ সাধনাকে মূল করিয়া এদেশে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে?" এই প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। চাই আমাদের হৃদয়ের উদারতা; সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের অর্থের বা ঐশ্বর্য্যের তারতম্য থাকিতে পারে; কিন্তু সবাই ভ্রাতা বলিয়া কেহই আমাদের ত্যাজ্য ও ঘৃণ্য নহেন। এ সাধনা যদি আমরা আমাদের মধ্যে আনিতে পারি, ব্যাপক শিক্ষার বিস্তার করিতে পারি, পরস্পরের ধর্ম্মপুস্তক পাঠের অভ্যাস ও অনুরাগ যদি সকলের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারি, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের দিকে তাকাইবার অভ্যাস যদি দেশের মধ্যে বদ্ধমূল করিয়া তুলিতে পারি, ধর্ম্মের সহিত যাহা অবিচ্ছিন্ন সেই পরলোকে বিশ্বাস যদি গাঢ় করিয়া তুলিতে পারি, তবেই প্রকৃত শিক্ষার সূচনা আরম্ভ হইবে। ধর্ম্মবিহীন শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়া আদৌ গণ্য হইতে পারে না।

৪। "এই পদ্ধতির শিক্ষাপ্রণালী, শিক্ষালয়ের গঠন বিধি, পাঠবিধি, শিক্ষণীয় বিষয় (অর্থকরী ও কার্য্যকরী ইত্যাদি সহ) কিরূপ হওয়া উচিত?" আমাদের উত্তর এই যে শিক্ষাপ্রণালীর মূল আদর্শচরিত্র শিক্ষকসংগ্রহ, যাঁহারা ভাবে কার্য্যে ছাত্রবর্গের সর্ব্ববিধ নৈতিক উন্নতিসাধনের সহায় হইতে পারেন। এইবিষয়ে বরিশালের জননেতা ও ছাত্রনেতা এবং দরিদ্রবন্ধু শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। পাঠ্যপুস্তকের ভিতরে ঈদৃশপ্রকৃতি বিরাটহৃদয় মহাজনগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্যের সবিশেষ পরিচয় থাকা চাই। কোমলমতি বালকবৃন্দ তরুণ বয়সে ইঁহাদের আদর্শে নিজ নিজ জীবনগঠনে প্রচুর সাহায্য পাইতে পারে। শিক্ষালয়ের গঠনবিধি হরিদ্বারের গুরুকুল, রাঁচির ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রভৃতির যেখানে যেটুকু ভাল পাওয়া যায়, সমস্ত মিলাইয়া গঠিত হইলে ভাল হয়। নীতিশিক্ষা ও আদর্শ জীবনগঠনের সঙ্গে অর্থকরী ও কার্য্যকরী শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। সকল বিদ্যালয়ে একই রূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর না হইলেও যতদূর পারা যায় কার্য্যকরী, অন্য কথায় লোকহিতকর ব্রতে ও পরসেবায় ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিতে হইবে।

৫। সমিতি একটি বিরাট জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংকল্প করিতেছেন, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত ব্যয়সাধ্য। বিশেষতঃ ঈদৃশ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রদিগকে বিদ্যালয়ে অবস্থান ও শিক্ষালাভের জন্য এত অধিক পরিমাণে মাসিক ব্যয় করিতে হইবে যে, দরিদ্র ছাত্রগণের সেখানে সমাবেশ অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে ঈদৃশ সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্য অস্থায়িক ব্যবস্থা করা

যাইতে পারে। মধ্যে মধ্যে মহৎচরিত্র ব্যক্তিগণের জীবনী-পাঠ ও ত্যাগী মহাত্মাদিগের দ্বারা উপদেশদানের ব্যবস্থা করিলে সুফল ফলিতে পারে।

সাধনা না হইলে কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ হয় না। এ বিষয়ে সাধনার প্রভাবে শিক্ষকগণকেও আদর্শচরিত্র ও ত্যাগী হইতে হইবে। বালকদিগের সহিত বন্ধুভাবে অবাধে মিলিত হইবার যোগ্যতা লাভ করিতে হইবে। তবেই তাঁহাদের শিক্ষা বালকগণের মধ্যে ফলবতী হইবে। সমিতির উদ্দেশ্য মহান তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষাকে একেবারে উপেক্ষা করিলে চলিবে না।

তীন্দ্রনাথ ঠাকুর/

নানা কথা।

নগ্নমূর্ত্তির বিরুদ্ধে—সংবাদপত্রে দেখিলাম যে, ডানফার্ম্মলীন (Dunfermline) এবং মণ্ট্রোজ (Montrose) নামক দুইটী স্থানের শিল্পপ্রদর্শনীতে কয়েকটী স্ত্রী ও পুরুষের নগ্নমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। দর্শকগণ উহার বিরুদ্ধে সবল আপত্তি করিলেন। উক্ত মূর্ত্তিগুলি যাঁহারা প্রদর্শনীতে দিয়াছিলেন তাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। কিন্তু ঐ দেশ তো আর ভারতবর্ষ নহে যে, সে দেশের লোকেরা বিচার না করিয়া, হাততালি বা অন্যবিধ স্বার্থের কারণে দেশের সর্ব্বনাশের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরের কথায় উঠিবে আর পরের কথায় বসিবে। সে দেশের লোকেরা জানে যে কিসে দেশের মঙ্গল হয় আর কিসে অমঙ্গল হয়। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে কয়েকজন আর্টিষ্ট সভ্যগণের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যে দর্শকগণের সুদৃঢ় আপত্তির ফলে সেই মূর্ত্তিকয়টী অপসারিত করা হইল। আর আমরা—আমরা nude cultকে আর্টের দোহাই দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই—দেশের ছেলেমেয়েরা তাহার ফলে নরকে বা যেথা ইচ্ছা সেথা যাক !!

রুষিয়া নামের উৎপত্তি—সেদিন আমার নিকট মঙ্গোলিয়া দেশীয় একজন বৌদ্ধ ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তিনি তিব্বতস্থ দেবং সহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দেখিয়া বুঝিবার উপায় নাই যে তাঁহার ভিতরে কত বিদ্যা আছে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে তিনি সজীব কোষ অভিধান বা living encyclopeadia। কথায় কথায় রুষিয়ার কথা উঠিল। তিনি 'উড়িসা' বলিয়া নানা কথা বলিতে লাগিলেন। আমি একটু ধাঁধায় পড়িয়া গেলাম—আমি 'রুষিয়া' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, আর ইনি 'উড়িসা' সম্বন্ধে বলেন কেন? অবশেষে তাঁহার সহিত আগত এক নেপালী ভদ্রলোকের সাহায্যে বুঝিলাম যে, তিনি 'রুষিয়া' সম্বন্ধেই বলিতেছেন—মঙ্গোলীয় ও তিব্বতীয় ভাষায় নাকি 'রুষিয়া'কে 'উড়িসা' বলে। উড়িয়া ভাষায় ওড্ দেশ বা উড়িষ্যাকে 'উড়িসা' বলে। আমার হঠাৎ মনে হইল যে, ওড্রদেশের 'উড়িসা' নাম প্রাপ্তির পর নিশ্চয়ই কোন উড়িষ্যাবাসী রাজা রুষিয়াতে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। রুষিয়াবাসীগণ সে সময়ে সম্ভবত নিতান্ত অসভ্য ছিল—উক্ত রাজা সমস্ত রুষিয়া সহজে অধিকার করিয়া তাঁহার সমস্ত রাজ্যের নাম 'উড়িসা' দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের অনুসন্ধায়ীগণ গবেষণার যথেষ্ট বিষয় পাইবেন। রুষিয়ার গ্রাম্যকথা (folktales) প্রভৃতি এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতে পারে।

নারীনৃত্য—গত ২৮শে চৈত্রের সঞ্জীবনীতে দেখিয়া সুখী হইলাম যে জনৈক ভদ্রমহিলা নারীনৃত্যের অন্তত আংশিক প্রতিবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এতদিনে সঞ্জীবনীর এবিষয়ে স্বার্থহানি সত্ত্বেও দৃঢ়প্রতিবাদ ফল ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। এখন নারীনৃত্যের পূতিগন্ধ বায়ু বহিতে বন্ধ হইলে বাঁচি।

গত ১৯ বৈশাখের সঞ্জীবনীতে নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে খুব সত্য কথা বাহির হইয়াছে। এখন যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, যাঁহারা নারীনৃত্যের প্রতি পক্ষপাত দেখাইতেছেন, তাঁহাদের যেন একটা জেদ চাপিয়া গিয়াছে—যেহেতু সঞ্জীবনীর দল, তত্ত্ববোধিনীর দল উহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতেছে, অতএব ভাল হউক বা মন্দ হউক আমরা দেখিব না—আমরা উহা চালাইব, এবং—চালাইব with vengeance। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথা বলিতে চাই—হিন্দুসমাজের মধ্যে কয়েকটী পরিবারের মহিলা এই প্রকার নৃত্যের পক্ষপাতী বলিয়া যেমন আমরা সমস্ত হিন্দুসমাজকে তাহার অনুরাগী বলিতে পারি না, সেইরূপ দুই-চারিটী ব্রাহ্ম পরিবারের বিবাহিত বা অবিবাহিত মেয়ে নৃত্য দেখাইয়া আত্মজাহির করিতেছেন বলিয়া যেন কেহ সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে দোষী না করেন এবং মহিলানৃত্য প্রভৃতি দুর্নীতিপোষক ক্রিয়াকলাপের পক্ষপাতী বিবেচনা না করেন। আমরা শুনিলাম যে থিয়েটারের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট একটী কাগজে কোন মহিলা লিখিয়াছেন যে, আদিসমাজ, সাধারণসমাজ এবং নববিধানসমাজ—ইহাদের কোনটাই তাহাদের কাগজে নারীনৃত্যের প্রতিবাদ করিতেছে না, সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে ঐ তিন সমাজই উহার পক্ষপাতী। কাগজখানি আমরা পাই না, সুতরাং লেখাটী স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাই নাই।

লেখিকা অন্তত আদিসমাজের উপর খুবই অবিচার করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইতেন যে, আদিসমাজ তাহার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দ্বারা নির্ভীকভাবে যথাশক্তি এবিষয়ে প্রতিবাদ করিতেছে। আমরা অবশ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র তত্ত্বকৌমুদীকে ও Indian Messengerকে মহিলানৃত্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে অবতীর্ণ দেখিতে আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু সঞ্জীবনী ও তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে এ বিষয়ে উহাদিগকে কাঁধে কাঁধ দিয়া দাঁড়াইতে না দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইয়াছি। নববিধানসমাজেরও ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে দাঁড়ানো উচিত—কেন দাঁড়াইতেছেন না কে জানে?

গত ৯ জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনী বলেন,—"কিছুদিন পূর্ব্বে * * * একব্যক্তি বিশ্বসম্মেলনের সাহায্যার্থ এম্পায়ার থিয়েটারে ভদ্রমহিলাদের দ্বারা 'সীতা' নামক অভিনয় ও নৃত্য করাইয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। পুনরায় সেই ব্যক্তি নারীশিক্ষালয়ের নামে হিন্দু ভদ্রমহিলাদের দ্বারা ঐ থিয়েটারে 'ঋতুরাজে'র অভিনয়-নৃত্য করাইয়া আরও কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে।" যাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, সঞ্জীবনী তাঁহাদের কয়েকজনের নাম দিয়াছেন। আমরা সেই নামগুলি দিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের নাম "ছাপার অক্ষরে" প্রকাশিত দেখিয়া বৃথা গর্ব্ব অনুভব করিবার অবসর দিতে চাহি না এবং আমাদের লেখনীকেও কলঙ্কিত করিতে প্রস্তুত নহি। আমরা ঐ সকল মহিলাদিগকে to say the least, বুদ্ধিমতী বলিতে পারি না। যাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের অভিভাবক কেহ আছেন কি না সন্দেহ করি।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পত্রিকাতে আমরা এবিষয়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি, সঞ্জীবনীর সাহায্যে তাহাতে সুধীজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে।

কাপুরুষের অধম—হইল কি? গত ১৬ই জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনীতে দেখি যে, "কোন মহিলা এক সংবাদপত্রে নারীনৃত্যের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উহা দেখিয়া একদল তরুণ যুবক সেই মহিলার বাড়ীতে গিয়া তাঁহাকে শাসাইয়া আসিয়াছে, তিনি যেন ভবিষ্যতে আর এরূপ প্রবন্ধ না লিখেন। মহিলাটী ভয় পাইয়াছেন।" নারীরক্ষাসমিতি হইতে এই বীর মহিলাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাঁহাকে জানানো উচিত যে ভগবানের রাজ্যে তিনি আছেন—তাঁহার চরণে সমস্ত নিবেদন করিয়া নির্ভীকহৃদয়ে যাহা সত্য, যাহা কল্যাণ বুঝিবেন তাহা প্রচার করুন। দরকার হয় ভগবানের কার্য্যে তাঁহারই দেওয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকুন। যাহারা এই মহিলাকে শাসাইয়াছে—ধিক তাহাদিগকে; ইহা অপেক্ষা কাপুরুষতা বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া জানি না।

নারী-ধর্ষণ—এ কাগজ সে কাগজ সকল কাগজেই আজকাল নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। মজা এই যে, যে কাগজে এই প্রকার প্রতিবাদ বাহির হয়, সেই কাগজেই আবার থিয়েটার মহিলানৃত্য প্রভৃতি দুর্নীতিপোষক অনুষ্ঠানগুলির শতমুখে প্রশংসা বাহির হয়। লোককে মদ খাওয়াইয়া মাতাল করিয়া তার পর তাহাকে মাতলামী করিতে নিষেধ করার সঙ্গে এই সকল কাগজের নারীধর্ষণের প্রতিবাদের তুলনা করা যাইতে পারে। তুলার গুদামে চারিদিকে তুলার গুঁড়া উড়িতেছে, সেখানে জ্বলন্ত অঙ্গার লইয়া গিয়া তুলার গুঁড়াগুলিকে জ্বলিয়া উঠিবার নিষেধ করাও যেরূপ, জনসাধারণের কামপ্রবৃত্তিকে শতবিধ উপায়ে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া পরে তাহাদিগকে নারীধর্ষণের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টাও অনেকটা সেইরূপ।

২৫০ বৎসরের বৃদ্ধ চীনেম্যান—লি চিংয়ন নামক একজন ঔষধ বিক্রেতা ও পর্য্যটক নিজের বয়স বলেন ২৫০ বৎসর। তাঁহার অনেক বন্ধু নাকি তাঁহা অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ও জীবিত! নর্থ চায়না হেরল্ড পত্রে লি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি "সুজেচুয়ানস্থ ওয়ানশনের উত্তরবর্ত্তী কাইসিনস্থ যাংচুয়ান গ্রামের একজন প্রাচীন ও সম্মানিত অধিবাসী।" মঞ্চু বংশীয় অন্যতর প্রথম সম্রাট কাংসির রাজত্বের সপ্তদশতম বৎসরে লি জন্মগ্রহণ করিয়া বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। অনেক সামরিক ও নাগরিক নেতা তাঁহাকে নানাবিধ সম্মানে বিভূষিত করিয়াছেন! তিনি খুব অল্প বয়সে পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি ঔষধোপযোগী ভৈষজ্য-সংগ্রহ ব্যবসায় হিসাবে অবলম্বন করিয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত উহাতেই নিরত ছিলেন। তাহার পর তিনি পুনরায় পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন এবং জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ঔষধবিক্রয়ে নিযুক্ত রহিলেন। প্রতিদিন তিনি ১০০ লাই পরিভ্রমণ করেন। চিনীয় এক লাইয়ের পরিমাণ ২১১৫ ফুট। সুতরাং লি প্রতিদিন ৪০ মাইল করিয়া বেড়ান। লি ১৪ বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অধস্তন একাদশ পুরুষ দেখিয়াছেন। তাঁহার বংশে ১৮০ জন আছে। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি উত্তম; দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি ও নখ সুন্দর আছে, তাঁহার স্মৃতিশক্তি অসাধারণ।

এই বিবরণ গত ৩রা সেপ্টেম্বরের (১৯২৮) ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে বাহির হয়। আমি ইহা প্রকাশ করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, আজ প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে গীতার

একটী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহার ভূমিকায় প্রয়োজন হওয়ায় আমি দেখাইয়াছি যে, মহাভারতকার বেদব্যাস অন্তত ২০০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তজ্জন্য অনেকে আমার প্রতি উপহাস বর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দৃষ্টান্তে এবং অন্যান্য অনেক ১২৫, ১৫০ প্রভৃতি বৎসরের দীর্ঘজীবী পাশ্চাত্যদিগের দৃষ্টান্তে আমি বুঝিতেছি যে, আমার অনুমান কিছুমাত্র অমূলক নহে। দীর্ঘজীবী যাঁহাদের কথা সংবাদপত্রে পাইয়াছি বা পাইব, তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

রাধাস্বামী সম্প্রদায়ে বিরোধ—সংবাদ-পত্রে (আ. বা. প০) দেখি যে, রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের সম্পত্তি লইয়া দুই দলে মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। মামলার বিচার্য্য বিষয় এই যে, প্রয়াগস্থ এই সম্প্রদায়ের কেন্দ্রসমিতির অধীন সম্পত্তি ট্রাষ্টের অধীন কি না এবং সমিতির জমাখরচের হিসাব তলব করা যায় কি না। সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

রাধাস্বামী সম্প্রদায়

রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের ধারণা এই যে, ঈশ্বর বা রাধাস্বামী দয়াল, সর্ব্বদা মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহাকে অবতার বা সদ্‌গুরু বলা হয়।

আগরার এক ধনী নাগরিক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি স্বামীজী মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। আগরায় তিনি যে উদ্যানে বাস করিতেন সেই উদ্যানের নাম স্বামীবাগ। এই উদ্যানে স্বামীজীর :একটি সমাধিমন্দির আছে। এই মন্দিরনির্ম্মাণে প্রায় এককোটী টাকা খরচ হইয়াছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী মহারাজের আবির্ভাব হয়। তাঁহার অনুচরগণ বলেন যে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঈশ্বরত্ব লাভ করেন।

অতঃপর রায় শালগ্রাম সিংহ বাহাদুর এই সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু হন। তিনি কিছুকাল যুক্তপ্রদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেল ছিলেন। ১৮৯৮ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি হুজুর মহারাজ নামে পরিচিত ছিলেন। হুজুর মহারাজের উত্তরাধিকারী হন মহারাজ সাহেব। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র। ইনিও পূর্ব্বে সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৯০৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাধাস্বামী সম্প্রদায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রয়াগী দল বলেন যে, মহারাজ সাহেব অবতার ছিলেন না, তাঁহার এক ভগ্নী অবতার ছিলেন। তিনি বুয়া সাহেবা নামে পরিচিতা ছিলেন। ১৯১৩ সালে বুয়া সাহেবার মৃত্যু হয়। বাবুজী মহারাজ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তাঁহার আসল নাম ছিল রায় সাহেব মাধোপ্রসাদ সিংহ। তিনি সরকারী একাউণ্ট বিভাগে কাজ করিতেন।

দ্বিতীয় দল বুয়া সাহেবাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা গাজীপুরের উকীল কামতাপ্রসাদ সিংহকে অবতার বলিয়া মানিতেন। ১৯১৩ সালে কামতাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁহারা শিবাজী মহারাজকে অবতার মানেন। শিবাজী মহারাজের নাম ছিল শ্রীআনন্দ স্বরূপ। তিনি টেলিগ্রাফ বিভাগে কাজ করিতেন।

প্রয়াগী দলের কথা

প্রয়াগ সৎসঙ্গ বলেন যে, তাঁহাদের সম্পত্তির জন্য কোন ট্রাষ্টের কথা কল্পনাও করা যায় না। সদ্‌গুরু ঈশ্বরের অবতার, সুতরাং সম্পত্তিতে তাঁহার পূর্ণ অধিকার আছে, তাঁহার নিকট কেহ হিসাব চাহিতে পারে না।

দ্বিতীয় দলের কথা

দ্বিতীয় দল বলেন যে, সদ্‌গুরু দুই ভাবে বিরাজ করেন। সাধারণ মনুষ্যরূপে তিনি সাংসারিক বিষয়-সম্পত্তি দেখেন, সদ্‌গুরুরূপে আধ্যাত্মিক বিষয় দেখেন। সুতরাং তাঁহার সম্পত্তির হিসাব তলব করা চলে।

সবজজের রায়

কাশীর সবজজের আদালতে প্রথমে এই মামলা হয়। তিনি রায় দেন যে, সৎসঙ্গের সম্পত্তি সার্ব্বজনিক ট্রাষ্ট, তাহার হিসাব তলব করা চলে। সেই রায়ের বিরুদ্ধে এই আপীল করা হইয়াছে।

এই প্রকার সাম্প্রদায়িকতার অতীত দৃষ্টিতে দেখিলে সবজজের রায় সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে হয়। সকল সমাজের, বিশেষত ধর্ম্মসমাজের আয়ব্যয়ের বিবরণ পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং সকল সময়ে তাহা যে কেহ দেখিতে চাহিবেন, তাঁহাকে দেখাইবার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। মধ্যে মধ্যে হিসাবপত্র সংবাদ-পত্রাদির সাহায্যে সাধারণের গোচর করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়।

প্রতাপ জয়ন্তী—১০ই জুন, জ্যৈষ্ঠ শুক্ল তৃতীয়াতে রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ বীর রাণা প্রতাপের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করি। বীরের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনে আমাদেরই উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয়।

—

গ্রন্থ-পরিচয়।

প্রকৃতি পরিচয়—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিত ভূমিকাসম্বলিত—শ্রীসতীন্দ্র নারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল প্রণীত। কালীতারা যন্ত্রালয় হইতে (১৬ টাউন-

সেণ্ড রোড, ভবানীপুর কলিকাতা) শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

গ্রন্থকার আমাদের পরিচিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাঁহার উড়িষ্যার কথা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বঙ্গভাষায় তাঁহার যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সংবাদপত্রাদিতে উহার উপযুক্ত সমালোচনাও প্রকাশ হইয়াছিল। গ্রন্থকারকে পদ্যেও হস্তক্ষেপ করিতে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কবিশেখর কালিদাস বাবু গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমরা অনেকাংশে একমত। কিন্তু কয়েকটী কবিতায় তাঁহার হাত বেশ একটু ফুটিয়াছে। "শীত", "শুষ্কপত্র" প্রভৃতি এমন কতকগুলি কবিতা আছে, যেগুলিকে আমরা কবিশেখরোক্ত "step" বা "সোপান" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ধরিতে পারি না—সেগুলির ভিতরে বেশ একটু মোলায়েম কবিতার ছাপ আছে। লেখক যদি কবিতালিখনের চর্চ্চা রাখেন, তবে অচিরে উচ্চশ্রেণীর কবিগণের মধ্যে তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

বঙ্গের পারিবারিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)—পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সম্পাদিত। ৫নং ডাঃ জগবন্ধু লেন বৌবাজার হইতে প্রকাশিত—মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ ডবলক্রাউন আকারে ৯৬পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গের কৃতী পুরুষের জীবনকথা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই সকল কৃতী পুরুষের অনেকেরই কথা অনেকেই বোধ হয় জানেন না। সেই জন্যই আমরা এই পুস্তককে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। এইরূপে বঙ্গের কৃতী পুরুষগণের চরিত্র আমাদের উত্তরপুরুষদিগের সম্মুখে ধারণ করা প্রার্থনীয় মনে করি। যাঁহাদের জীবনকথা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্বের কারণকেন্দ্রটী ফুটাইয়া তুলিলে ভাল হইত। রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধুর মৃত্যুকালে পুত্রদিগের প্রতি উপদেশ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী—

"আমার চরম কথাগুলি স্মরণ রাখিও—বিলাসিতায় কখনও মজিও না। যতই উচ্চ পদ হউক না কেন, ব্যবসায় ভিন্ন কদাচ বংশের মধ্যে যেন কেহ চাকরী না করে। ব্যবসায়ে ফেল হইলে বরং পানের দোকান করিয়া খাইও, তবু কোন উচ্চ রাজপদ পাইলে চাকুরী করিও না।" বীরের উপযুক্ত কথা।

হোমিওপ্যাথিক নীতিরত্নমালা—ডাক্তার শ্রীঅজিতশঙ্কর দে প্রণীত। প্রকাশক:—হোমিওপ্যাথি সার্ভিং সোসাইটি (ইণ্ডিয়া) ৫নং ভিক্টোরিয়া রোড, পোঃ বরাহনগর, কলিকাতা। মূল্য আট আনা মাত্র।

হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যতই বেশী পুস্তকাদি প্রকাশিত হয় এবং যতই উহার প্রচার বেশী হয়, ততই আমি দেশের মঙ্গল বিবেচনা করি। আমার কর্ম্ম হইতে যখন দুই বৎসরের দীর্ঘ অবকাশ লইলাম, তখন আমি অন্তরে এবং বাহিরে বন্ধুগণের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই দুই বৎসরের মধ্যে এমন কোন্ বিষয় শিক্ষা করিতে পারি যাহাতে Greatest good of the greatest mumber within the shortest time করা যাইতে পারে। শেষে ভালরূপ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম যে, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশিক্ষা করাই একমাত্র পন্থা। বাল্যকালে আমার এক-আধটু ঠাণ্ডা লাগিলেই গলায় বীচি দেখা দিত। অবশেষে হোমিওপ্যাথিতে অভিজ্ঞ আমার এক আত্মীয় Calcarea Carb 30 এক ফোঁটা দিলেন, ফলে আর বীচি দেখা দিত না—ধাতই বদলাইয়া গেল। তাহার পূর্ব্বে হোমিওপ্যাথিতে একটুও বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু সেই অবধি বিশ্বাস জন্মিল। অ্যালোপ্যাথিভক্ত বন্ধু যিনি যাহাই বলুন না কেন, আমি তো প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমার পরম বন্ধু পরলোকগত ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রলাল গুপ্ত (Dr. G. L. Gupta) আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ভগবানকে কৃতজ্ঞতাভরে নমস্কার করি যে, তিনি এই পথে আমাকে নামাইয়াছিলেন। ইহার ফলও এইখানে বলিয়া রাখা সঙ্গত মনে করি। কটক হইতে সুদূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত জমিদারীতে প্রজাগণের মধ্যে একবার রক্তামাশয়ের epidemic লাগিয়াছিল। সেখানে নিকটবর্ত্তী দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে চিকিৎসার কোনই ব্যবস্থা ছিল না। আমি গিয়া শতাধিক রোগীর চিকিৎসা করিয়া প্রায় শতকরা ৯৫ জনকে আরোগ্য দানে সক্ষম হইয়াছিলাম। এস্থলে অ্যালোপ্যাথিক বা কবিরাজী প্রভৃতি ব্যয়সাপেক্ষ ঔষধ ব্যবহার করিবার না ছিল প্রজাদের ক্ষমতা, না ছিল সুবিধা।

যাক, আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত। আমাদের কিন্তু মনে হয় প্রশ্নোত্তরের পরিবর্ত্তে ধারাবাহিক আকারে লিখিত হইলে বেশী ভাল হইত—শিক্ষার্থীর মনে বেশী বদ্ধমূল হইত। আমার যাহা মনে হয় তাহা লিখিলাম, কিন্তু আমার অপেক্ষা গ্রন্থকারের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অধিক। প্রশ্নোত্তর হিসাবে এসকল বিষয় লিখিত হইলে মনে হয় যেন চিন্তার সূত্র কাটিয়া যায়। আর একটী কথা বলিতে চাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় গ্রন্থ-

কার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধীয় অনেকগুলি তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, এক-একটী বিষয়ের এক-একটী সহজবোধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিলে এবং একখানি পুস্তকে সংক্ষেপে একটী বিষয়ের সকল জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট করিলে ভাল হয়। আলোচ্য পুস্তিকা প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে উপকারী হইলেও, যে ভাবে ইহা লিখিত হইলে ইহার উপকারিতা বেশী হইবে, তাহাই আমরা দুই চারি কথায় প্রকাশ করিলাম।

শোকসংবাদ।

৺অমরকুমার মুখোপাধ্যায়—আদিব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ৺প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা অমরকুমার মুখোপাধ্যায় গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার প্রাতঃকালে লক্ষ্ণৌএ হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৫১ বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর এই অকালমৃত্যুতে শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইহাঁদের গভীর শোকে সান্ত্বনাবিধান পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মাকে আপন স্নেহাশ্রয় দান করুন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ৺অমরকুমার মুখোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান অমিতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বালিগঞ্জে ৭-১ বাণ্ডেলরোডে স্বকীয় বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ষোড়শদ্রব্য সহিত ভোজ্যাদি উৎসর্গের পর পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

চতুর্থাহ শ্রাদ্ধ—৺অমরকুমার মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীঅনুভা দেবী ও শ্রীঅমিয়া দেবী আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি চতুর্থী ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

উপনয়ন—গত ২৮শে বৈশাখ শনিবার পূর্ব্বাহ্নে অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্যলগ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষিত শিষ্য ৺তারিণীচরণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠপৌত্র শ্রীমান সমীন্দ্র-কুমার গুপ্তের উপনয়ন-সংস্কার আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের শ্রীরামপুরের বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

সংবাদ।

প্রবর্ত্তকসঙ্ঘে সাহিত্যসভা—প্রবর্ত্তকসঙ্ঘের অক্ষয়তৃতীয়ার উৎসবে আমন্ত্রিত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধিরূপে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ মহাশয় গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার অপরাহ্নে উহার সাহিত্যসভার অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথম অধ্যাপক শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া বৌদ্ধ-জাতক অবলম্বনে একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। ইহাতে তিনি মহাভারতের সঙ্গে বৌদ্ধজাতকের তুলনামূলক সমালোচনায় হিন্দু আদর্শ হইতে বৌদ্ধ আদর্শের ভিন্নতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় বহুবিচারসাপেক্ষ। একটী মাত্র প্রবন্ধে বা বক্তৃতায় উহার কোনও স্থির সিদ্ধান্ত করা চলে না। উক্ত সভাতেই এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, প্রসঙ্গত বৌদ্ধজাতক সম্বন্ধে এখানে একটী প্রশ্ন তুলিতে চাই। এবার এই জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা তত্ত্ববোধিনীতে 'রাজকুমার বেস্‌সন্তর' নামে জাতকের একটী গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে জনৈক বোধিসত্ত্ব বুদ্ধত্বলাভের আকাঙ্ক্ষায় দানপারমিতার উৎকর্ষ দেখাইতে যেভাবে পিতৃধর্ম্ম ও পতিধর্ম্মের অবমাননা করিয়াছেন, আমাদের আধুনিক চিত্ত তাহাতে মোটেই সায় দেয় না। অত্যাচারী ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় আশ্রয়-প্রার্থী পুত্রকন্যার প্রতি বেস্‌সন্তরের উদাসীনতা দুর্ব্বোধ্য। সত্য বটে, মহাভারতে দানবীর কর্ণও আপন পুত্রের শিরশ্ছেদ পূর্ব্বক অতিথির তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তো পুত্রের সম্পূর্ণ সম্মতিতে। ভয়ার্ত্ত পুত্র যদি প্রাণভয়ে পিতার শরণ লইত, আর পিতা যদি সেই নিঃসহায় ও নিরুপায় পুত্রের বধসাধন পূর্ব্বক আপন গর্ব্বময় দাতৃধর্ম্ম চরিতার্থ করিতেন, তবে তাহা কতদূর সুসঙ্গত হইত বলিতে পারি না। আর এই সকল আখ্যায়িকাতেও যে বৌদ্ধভাবের প্রভাব নাই, তাহাও বলা কঠিন।

অতঃপর মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় অধুনা বঙ্গীয় সমাজের অধঃপাতের পূর্ণ নিদর্শন 'নারীনৃত্য' সম্বন্ধে একটী জ্বালাময়ী রচনা পাঠ করেন। তাঁহার এই সুসঙ্কল্প ও শুভ প্রচেষ্টার জন্য আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। প্রথম হইতেই সঞ্জীবনী ও তত্ত্ববোধিনী এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লেখনী

সঞ্চালন করিয়াছেন; কিন্তু উহা পর্য্যাপ্ত নহে। ব্যাধি যেরূপ বিস্তারশীল তাহাতে দেশব্যাপী একটা প্রবল আন্দোলন-সৃষ্টি আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাধির প্রকোপও যে কিরূপ ভীষণ, তাহা উক্ত সভায় সমাগত সভ্যগণের (আমরা আর নাম করিয়া তাঁহাদের লজ্জার কারণ হইব না) মধ্যে মাত্র একজন ব্যতীত বাকী সকলেই চারুবাবুর বক্তব্যের অংশতঃ প্রতিবাদ করায় জানা গিয়াছে; সুতরাং আশু প্রতীকার চেষ্টা কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠের 'প্রবর্ত্তক' এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই; সেদিন নারীনৃত্য লইয়া যে সাহিত্যিক বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, এ সম্বন্ধে মতি বাবুর সুস্পষ্ট মন্তব্য আমরা দেখিতে চাই।

রাজদ্রোহে শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।—আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম, আমেরিকাবাসী শ্রীযুক্ত সাণ্ডারলাণ্ড সাহেবের 'শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারত' (India in bondage) নামক পুস্তকের প্রকাশ ব্যাপারে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে তাঁহার স্বগৃহে রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বন্দী হন এবং আপাততঃ জামিনে মুক্ত আছেন। মানবাত্মার স্বাধীনতা এভাবে রুদ্ধ করিতে যাওয়া শুধু অসমীচীন নহে, কিন্তু বৃথা মনে করি। শাসকবর্গকে বলা বাহুল্য যে বাতাসকে অতিমাত্র চাপে আবদ্ধ করিবার ন্যায় মানবাত্মাকেও অতিমাত্র চাপে আবদ্ধ করিতে গেলে তাহা ফাটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবেই। বহিঃপ্রকৃতির ন্যায় আধ্যাত্মিক রাজ্যেরও ইহা একটা মহা সত্য।

সাপ্তাহিক উপাসনা।—আমরা সানন্দে জানাইতেছি বৈশাখ অবধি নানা উপায়ে আদিব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার উৎকর্ষ বিধানের বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। যদি কোন হিতৈষী এই কার্য্যে আমাদের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহা সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

উপনিষৎপাঠ।—প্রায় ৪ মাস হইতে চলিল আদিব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক শ্রীমান্ ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহে ও উদ্যোগে গত ২৪শে মাঘ বুধবার হইতে আদিব্রাহ্মসমাজে একটী আলোচনাসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পূর্ব্বে সাপ্তাহিক উপাসনা অন্তে সমাজের দ্বিতল-গৃহে উহার অনুষ্ঠান হইত। গত বৈশাখ অবধি উপাসকগণের অনুরোধে ত্রিতলে বেদীর নিম্নে বসিয়া আপাততঃ ঈশোপনিষদের পাঠ ও আলোচনা হইতেছে। পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের সহযোগিতায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই পাঠের ভার গ্রহণ করায় আমরা সুখী হইয়াছি। বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা সমবেত বন্ধুগণের বড়ই চিত্তপ্রসাদক ও প্রাণস্পর্শী হইতেছে।

মেডিক্যাল মিশন।—আদিব্রাহ্মসমাজের নিম্নতলে একটী "মেডিক্যাল মিশন" প্রতিষ্ঠার শুভ সঙ্কল্প বহুদিন হইতে আমাদের অন্তরে জাগরূক আছে। পূর্ব্বে দুইবার ইহা কার্য্যে পরিণত হইলেও উপযুক্ত সেবকের অভাবে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। সম্প্রতি দুই জন চিকিৎসক স্বেচ্ছায় আমাদিগকে এবিষয়ে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হওয়ায় আমরা সত্বরই পুনরায় উহা খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছি। এবিষয়ে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য ভাবিয়া যিনি অল্পবিস্তর যতটুকু সাহায্য করিবেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। সাহায্যদাতার নাম ও দানের পরিমাণ ও হিসাব তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

বুদ্ধাষ্টমী।—গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কলেজ স্কোয়ারে 'মহাবোধি সোসাইটী হলে' বুদ্ধাষ্টমী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৭ ঘটিকায় আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের জগদ্ব্যাপী শান্তিবাণী সম্বন্ধে যে সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটী দিয়াছিলেন, উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

চিত্রকথা।—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ মহাশয়ের সংগৃহীত বাঙ্গলার খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের জননীদের ফটো-চিত্রের বাকী অংশ 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র সৌজন্যে প্রকাশিত হইল। এবিষয়ে মন্মথবাবুর সুলিখিত প্রবন্ধটী প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এবারে স্থানাভাবে ঘটিয়া উঠিল না। উহা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভ্রমসংশোধন।

গত বৈশাখ-সংখ্যা পত্রিকায় 'আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে ২১ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ২য় প্যারার দ্বিতীয় পংক্তির পর "স্বীয় স্বীয় স্বাতন্ত্র্য গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রাতকূল। উভয়ের" এই অংশটুকু বসিবে।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি:—

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবীর নিকটে

৺সাহানা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধে ... ২৲

৺বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ... ২৲

শ্রীযোগানন্দ সিংহ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী
শ্রীশোভারাণী দেবীর দীক্ষাগ্রহণ উপলক্ষ্যে ২৲

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

[সমালোচনা]

(হিমালয় পরিভ্রমণকারিণী শ্রীরত্নমালা দেবী)

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি-বিরচিত, বহু চিত্রশোভিত, সুন্দর সবুজ কাপড়ের স্বর্ণাঙ্কিত বাঁধাই; কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৷০ আনা। প্রাপ্তিস্থান—আদিব্রাহ্মসমাজ-কার্য্যালয় ৫৫, আপার চিৎপুর রোড যোড়াসাঁকো কলিকাতা।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাঁহার পুস্তকখানির ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং উহা বহু গবেষণাপূর্ণ। আর্য্য নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার বিষয় তিনি সরলভাবে নির্ভীকভাবে সুস্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন। তাঁহাকে এই পুস্তকখানি লিখিতে মনুসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি বহু শাস্ত্রগ্রন্থের সহায়তা লইতে হইয়াছে। প্রাচীন যুগের ঋষিবাক্যের অনেক স্থলেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। তিনি উদারহৃদয়, স্পষ্টবাদী ঋষিকল্প ব্যক্তি। তাঁহার পুস্তকখানিতে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ ও যুক্তি দেখাইয়াছেন। বৈদিকযুগে যে আর্য্যনারীর শিক্ষাব্যবস্থা ছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়; কেননা সেই যুগের নারীরাও বেদপাঠ করিতেন ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা ছিলেন। মহাভারত প্রভৃতি পুরাণপাঠে জানা যায় যে, গার্গী মৈত্রেয়ী অরুন্ধতী অনসূয়া প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন। মধ্যযুগের ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, দ্রৌপদী ভদ্রা রুক্মিণী সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী সকলেই বিদুষী ছিলেন।

বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মানুরক্তি প্রবল ছিল। আর্য্যরমণীর শিক্ষা যে তাঁহাদের অনুরূপ ভাবেই হওয়া উচিত, একথাটি খুব সত্য। আমাদের সমাজ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত। যে শিক্ষায় আর্য্যনারীদের হৃদয়ে দয়া দাক্ষিণ্য সরলতা স্নেহ মমতা প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তির বিকাশ হইয়া তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণা ও পতিসেবাপরায়ণা হইতে পারেন, এবং তাঁহারা গার্হস্থ্যনীতি শিক্ষা করিয়া মাতৃত্বের মহিমময়ী মূর্ত্তিতে নারীসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, সেই শিক্ষাই আর্য্যনারীর প্রকৃত শিক্ষা। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের চরিত্র গঠন করা।

ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাঁহার পুস্তকের সর্ব্বত্রই নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতায় "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এটীও দেখাইয়াছেন। আর্য্যনারীদের স্বাতন্ত্র্য বা স্বেচ্ছাচার শোভনীয় নহে। যে শিক্ষায় আর্য্যনারীদিগকে বহির্মুখী করে, চঞ্চল করে, বিলাসপরায়ণ করে, স্বার্থপর করে, সে শিক্ষা কখনই আর্য্যনারীর প্রকৃত শিক্ষা নহে। আজকাল আমাদের দেশের নারীরা উচ্চ শিক্ষা পাইয়া এম-এ, বি-এ পড়িয়া পাশ্চাত্যভাবেই গঠিত হইতেছেন। তাঁহাদের বিলাসব্যসন অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে তাঁহারা বহু বিলাস-আড়ম্বর ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য লইয়াই সময় কাটাইয়া থাকেন। কিন্তু নারীসমাজের মঙ্গলের দিকে কেহই বড় একটা লক্ষ্য রাখেন না। তাঁহারা থিয়েটারে বায়স্কোপে ডিনার পার্টিতে টেনিশ পার্টিতে যোগ দিয়াই নারীত্বের পূর্ণতা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু যে শিক্ষায় আর্য্যনারীরা ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় পানীয় রোগে সেবা শোকে শান্তি দিয়া অভাব-অসচ্ছলতাপূর্ণ বঙ্গগৃহের সুখ শান্তি পবিত্রতা আনয়ন করিতে পারেন সেই শিক্ষাই প্রার্থনীয়। যাঁহাদের অল্পশিক্ষা, তাঁহারা নাটক নভেল ও বাজে পুস্তক পড়িয়াই সময় কাটাইয়া থাকেন। কিন্তু আর্য্যনারীগণ যে শিক্ষায় জগতের মাতা জগতের বন্দনীয়া হইয়া সংসারে মাতৃত্বের মহিমায় ও পত্নীত্বের ঐশ্বর্য্যে বিভূষিতা হইতে পারেন, সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়।

বৈদিক যুগের নারীগণের উপনয়ন-সংস্কার ও ব্রহ্মচর্য্য ছিল, ক্ষিতীন্দ্রবাবু তাহারও প্রমাণ দিয়াছেন। বিধবারা আমরণ ব্রহ্মচর্য্য করিবেন। যাগযজ্ঞে ব্রতে তপস্যায় ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসবে স্ত্রীই পতির সহধর্ম্মিণী ছিলেন। রামায়ণে লিখিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র সীতাদেবীকে বনবাসে দিয়াও সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণও নারীগণকে বারম্বার পতিসেবার উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ঋষিরা কখনই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না; তবে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যানুশীলন বেদবেদাঙ্গ উপনিষদাদি পাঠ অপেক্ষা তাঁহাদের পিতাপুত্রের সেবা ও গার্হস্থ্য নীতিপালন, যাহা নারীজীবনের কর্ত্তব্য, সেই দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

আমার মাতামহদেব ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রীশিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু সরলভাবে অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা বুঝাইয়াছেন। আমাদের দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে বিশেষ সুফল হইতেছে আমরা তাহা মনে করি না। সেকালের প্রাচীনা বর্ষীয়সীগণ নিরক্ষর হইলেও তাঁহাদের মধ্যে দয়াভক্তি স্নেহমমতা বা কর্ত্তব্যপরায়ণতার ত্রুটী ছিল না। তাঁহাদের অনেকেই আদর্শ গৃহিণী ও আদর্শ জননী ছিলেন। ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননীর দয়াগুণে বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হৃদয়ে দয়ার উৎস ছুটিয়াছিল। আর্য্য শাস্ত্রকারগণ যে স্ত্রীশিক্ষার

বিরোধী ছিলেন না, তাহা পুরাণ মহাভারত পাঠে স্পষ্টই উপলব্ধি হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য শিক্ষা যে আর্য্য নারীর পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে, পাশ্চাত্য জগতে স্ত্রীশিক্ষার ফলে নারী সম্বন্ধীয় ঘটনা লইয়া যে সকল মামলা মোকদ্দমা অশান্তির সৃষ্টি হয়, তাহা হইতেই বুঝা যায়। যেস্থানে অন্যের মুখের গ্রাস লইয়া কাড়াকাড়ি, যেথানে বৈষয়িক বিবাদের বাড়াবাড়ি, যেথানে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসার, যেথানে যদৃচ্ছা আমোদপ্রমোদের বাহুল্য, সেস্থান আর্য্যনারীর নহে। বঙ্গসংসারে আর্য্যনারীর পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর্য্যনারী গৃহের সমগ্র পরিবারের অস্তিত্বে নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মিলাইয়া দেন, তিনি নিজের সুখ-দুঃখের পৃথক দাবী রাখেন না।

তৎপরে ক্ষিতীন্দ্রবাবু আর্য্যনারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা যে বহু যুক্তিপূর্ণ সার সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আর্য্যনারী বিবাহিতা হইলে সম্রাজ্ঞী হইয়া থাকেন। এক-একটী ক্ষুদ্র সংসাররাজ্যের পরিচালনা নারীই করিয়া থাকেন। সেথানে তাঁহাদের অবাধ স্বাধীনতা থাকে। আর্য্যনারী প্রকৃতপক্ষে কোন কালেই পরাধীনা নহেন। যাগযজ্ঞ ব্রতপূজা বিবাহাদি মহোৎসবে তীর্থযাত্রায় তাঁহাদের অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা আছে। পিতা ভ্রাতা খুড়া জ্যেঠা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের নিকট তাঁহারা অবাধে সম্মুখীন হইয়া থাকেন। তবে, প্রাচীনকালে স্ত্রীলোকেরা নিঃসম্পর্কীয় পুরুষগণের সহিত এথনকার মত এত অবাধে মেলামেশা করিয়া হারমোনিয়াম বাজাইয়া গীতবাদ্য করিতেন না। তাঁহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল। ক্ষিতীন্দ্রবাবু আর্য্যনারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে যে চিন্তাশীলতা, ভাবপ্রবণতা ও গবেষণা দেখাইয়াছেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ দূরদর্শী লেথক ক্ষিতীন্দ্রবাবু প্রাচীনকালের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে সকল আদর্শ দেথাইয়াছেন, তাহার একটীও অতিরঞ্জিত নয়। শিক্ষা, স্বাধীনতা বা সমাজসংস্কারে ঋষিপ্রদর্শিত পথই যে আমাদের পরিণামে সুফলসাধক তাহাতে ভুল নাই। পাপদোষ ও ব্যভিচারের ফলে যে জাতি উৎসন্ন হয়, তাহার তিনি অনেক অনেক উদাহরণ দিয়াছেন। আমাদের সমাজদেহে ক্ষত হইয়াছে। সে ক্ষত আরোগ্য করিতে হইলে বিধিমত চিকিৎসা করা চাই। বর্ত্তমান হিন্দুনারীসমাজের স্বেচ্ছাচারিতাই রোগের অনেকটা কারণ। লেথক অকপটে তাঁহার পুস্তকথানিতে স্ত্রীসমাজের ও পুরুষসমাজের নৈতিক আচার-ব্যবহারের প্রকৃত চিত্র চক্ষের সম্মুথে ধরিয়া সুস্পষ্টভাবে দোষগুণ ব্যক্ত করিয়াছেন। এথন নব্যতন্ত্রের শিক্ষিতা নারীগণের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতা ও বহির্মুখীভাবই প্রবল। তিনি কোনও বিষয়েই কিছু গোপন না রাথিয়া সমাজের দোষ ও গুণ যে অকপটে দেথাইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তাঁহাকে অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইবে। কিন্তু সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও প্রয়োজন পড়িলে বলিতে হয়। এজন্য সত্যনিষ্ঠ লেথক ক্ষিতীন্দ্র বাবু সমাজচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া সমাজের উপকারসাধনই করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের সঙ্গে নব্যযুগের ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাজনীতি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে কতটা পার্থক্য প্রবীণ লেথক তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য রীতিনীতি যে আর্য্য নারীদিগকে সর্ব্বতোভাবে উন্নতিসোপানে লইয়া যাইতে পারে না, তাহা তিনি তাঁহার পুস্তকে পরিষ্কার দেথাইয়াছেন। আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা প্রাচীন আর্য্যযুগের পবিত্র চিরন্তন বিধি পদদলিত করিয়া এথন পাশ্চাত্য ভাবেরই আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অবনতি ভিন্ন উন্নতির আশা করা যায় না। ধর্ম্মেই মানবজীবনের উন্নতি চিরকালই হইয়া থাকে। লেথক এই উদ্দেশ্যেই পুস্তকথানি লিথিয়া সাধারণের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মোটের উপর বলিতে পারি যে, গ্রন্থথানি পাঠ করিয়া নারীসমাজ নিশ্চয়ই উপকৃত হইবেন। গ্রন্থে তিনি নির্ভয়ে স্পষ্ট কথা ও সার সত্য লিথিয়া সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

সঞ্জীবনী—২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৫।

আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

(২০৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীমানি বাজার

আমাদের এথানে সর্ব্ববিধ মিষ্টান্ন অতি বিশুদ্ধ ঘৃতে প্রস্তুত হয়। আমরা বিবাহাদি উৎসবের কণ্ট্রাক্টও লইয়া থাকি। আমাদের দোকানের বিশেষ সুবিধা এই যে বসিয়া থাওয়ারও বন্দোবস্ত আছে।

আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথের

নূতন পুস্তক। **খেয়াল** নূতন পুস্তক।

প্র কা শি ত হ ই ল।

সরস ভঙ্গিতে <u>অভিনব</u> ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। অথচ প্রবীণ গ্রন্থকারের প্রাসঙ্গিক পরিপক্ক চিন্তাগুলির মধ্যে ভাবিবার চিন্তিবার অনেক বিষয় স্বতই সমাবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। রয়াল ১৬ পেজী আকারের ১৲+২৬৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ৯ খানি হাফটোন-চিত্রে সুশোভিত; ছাপা ও কাগজ ভাল। উৎকৃষ্ট সবুজ কাপড়ে স্বর্ণাঙ্কিত সুন্দর বাঁধাই। মূল্য ১৷৷৹ মাত্র। ডাঃ মাশুল ⁄৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—আদিব্রাহ্মসমাজ-কার্য্যালয়; ৫৫, আপার চিৎপুর রোড জোড়াসাঁকো কলিকাতা।

বিনাপণে বিবাহ সমিতি।

আজকাল কন্যাদায় একটি কঠিন সমস্যা হইয়াছে। প্রায়ই ভদ্রলোক ২।১টি কন্যার বিবাহ দিয়া একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু কুটুম্ব লইয়া সারা জীবন অস্থির হইয়া পড়েন। **ইহা একমাত্র ঘটকের প্রতারণা।** এইরূপ ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। তাই বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের অনুরোধে সমাজসেবা করার জন্য আমরা 'বিনাপণে বিবাহসমিতি' স্থাপন করিয়াছি।

আমাদের সমিতির নামই আমাদের সদুদ্দেশ্যের পরিচয় দেয় যে আমরা বিনা পণে বিবাহ ঠিক করিয়া দিব। অথচ পারিশ্রমিকের জন্য আমাদের কোনরূপ পীড়ন নাই। কেবলমাত্র সমিতি ব্যয় পরিচালনের জন্য নাম মাত্র পারিশ্রমিক লইয়া থাকি। আমাদের সন্ধানে সর্ব্বশ্রেণীর বহু পাত্র-পাত্রী আছে। যাঁহার যাহা আবশ্যক হয় পত্র-দ্বারা অথবা নিজে আসিয়া অনুসন্ধান করুন। এই সামাজিক দুর্দ্দিনে আমরা সমাজের এই গুরুতর সেবাব্রত আনন্দে গ্রহণ করিলাম। আমাদের আশা আছে যে ঈশ্বরানুগ্রহে ও সামাজিকবর্গের সহানুভূতিতে আমরা কৃতকার্য্য হইব।

ইহা ছাড়া যাহারা পণ লইতে ও দিতে ইচ্ছুক এরূপ সর্ব্বশ্রেণীর অন্য পাত্র-পাত্রী আছে। বিধবাবিবাহও আমরা দিয়া থাকি। আজকাল প্রায়ই ধর্ষিতা ও কুচরিত্রা নারীগণকে সর্ব্বসাধারণে ৺নবদ্বীপধামে ইত্যাদিতে রাখিয়া আসেন, কিন্তু তাহাতে সুফল হয় না; কিছুদিন পরে উক্ত নারীগণ পাপের পথে বিচরণ করে। কিন্তু এরূপ অবস্থায় আমাদের সংবাদ দিলে আমরা ঐ সকল নারীকে পুনরায় বিবাহ দিয়া সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিয়া থাকি। পরিত্যক্ত শিশুর সংবাদ পাইলে সমিতির তত্ত্বাবধানে তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সমাজ-সেবক—বিনাপণে বিবাহসমিতি, ১৭০নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বঙ্গসাহিত্যের একটী অভাব বিদূরিত হইল।

লোকমান্য ৺বালগঙ্গাধর তিলক প্রণীত

শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতারহস্যের

বঙ্গানুবাদ—পুস্তকাকারে পুনরায় প্রকাশিত হইল।

অনুবাদক—৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল্য ৪৲ টাকা। ভিঃ পিঃ ডাকমাশুল ৸৹।

বৃহৎ গ্রন্থ; ডিমাই ৮ পেজী, ৯০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; সুন্দর কাপড় বাঁধাই। দুইখানি ত্রিবর্ণিক রঙ্গিন চিত্রে সুশোভিত।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ লক্ষাধিক বিক্রীত হইয়াছে। বাঙ্গালী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই এই গ্রন্থ অবিলম্বে ক্রয় করিবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি; ইহাতে আছে—সমগ্র প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতবাদ-সমূহের তুলনাত্মক সুবিস্তৃত আলোচনা, গীতার বহিরঙ্গ পরীক্ষা, এবং অর্থনির্ণায়ক টিপ্পনী প্রভৃতি। এই গ্রন্থ একখানি ঘরে থাকিলে গীতা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ই অজ্ঞাত থাকিবে না।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—তৃতীয় ভাগ

সংখ্যা
১০৩১

১৮৫১ শক
আষাঢ়

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৭তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ১০০। সাল ১৩৩৬। শক ১৮৫১। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৬। কলিগতাব্দ ৫০৩০।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১১২ অঞ্জলি—বন্ধু দেবতা।

১। তুমি ত্রিলোকের অধিপতি। তুমিই আমাদের মনেরও নিয়ন্তা। তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমাকে জানিয়া তোমার চরণতলে উপস্থিত হইতে পারি। আমাদের পিতৃপুরুষেরা যে সরল পথে তোমার চরণে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও তুমি সেই সরল পথ দেখাইয়া দাও।

২। তোমাকেই কেন্দ্র করিয়া তোমার চারিদিকে অসংখ্য কর্ম্মযজ্ঞ দিবানিশি অনুষ্ঠিত হইতেছে। তোমারই বলক্রিয়া প্রকৃতির মধ্যে নিত্য প্রকাশিত হইয়া প্রকৃতিকে সুশোভন করিয়া তুলিয়াছে। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তোমার জ্ঞানক্রিয়া স্বাভাবিক। তুমি প্রজাদিগের কাম্য বস্তুসকল নিত্য বিধান কর। তোমার মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়।

৩। সুবিস্তীর্ণ সাগর তোমারই উদার ভাব প্রকাশ করিতেছে। তোমার তেজ সর্ব্বত্র প্রসারিত। তুমিই আমাদের প্রিয়তম। তুমিই আমাদের ভুলভ্রান্তি মার্জ্জনা করিয়া অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণের মত আমাদিগকে তেজসমুজ্জ্বল কর। তুমিই আমাদিগকে পুষ্টিতুষ্টি সকলই প্রদান কর।

৪। দ্যুলোকে ভূলোকে, ভূধরে সাগরে, ওষধিতে বনস্পতিতে তুমি তোমার স্বীয় তেজে নিত্য স্বপ্রকাশ। জ্ঞানী ও সাধুদিগের অন্তরে তুমিই প্রকাশিত হও। সাধু অসাধু সকলেই তোমার করুণা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৫। সংসারে যাহা কিছু অসাধু, তাহা তোমার তেজে স্বতই দগ্ধ হইয়া যায়। তুমিই জগতের মঙ্গলের জন্য সাধুদিগকে নিয়ত রক্ষা কর। তুমিই সর্ব্বাধিপতি। তুমিই যজ্ঞানুষ্ঠাতার শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ এবং সুন্দর ও পবিত্র মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে নিত্য প্রকাশিত হও।

৬। তুমি ওষধি-বনস্পতিতে থাকিয়া জীবসমূহের জীবনধারণের উপায়বিধান করিতেছ। তুমি আমাদের রোগশোক হরণ কর। তুমি অমৃতপুরুষ। তুমি আমাদিগকে মৃত্যুকে অতিক্রম করিবার অধিকার ও শক্তি প্রদান কর। আমাদিগকে তোমার নামগানে সর্ব্বদাই নিযুক্ত রাখ। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৭। আমরা শৈশবে ক্রীড়াকৌতুকের মধ্যে যেন জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির পথে চলি। আমরা যৌবনে শতবিধ শুভকর্ম্মের ভিতর দিয়াও যেন তোমারই মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিরত থাকি। আমরা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে পুত্রপৌত্রাদি সন্তান সন্ততির প্রতি এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি অযাচিত স্নেহপ্রেম শতধারে বিতরণ করিয়া সংসারে যেন তোমারই আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করি।

৮। তুমি তোমার অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে প্রভূত ধনরত্ন প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদের শত্রুগণের অভিলষিত বিনাশ হইতে রক্ষা পাই। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সহায়। আমরা তোমাকে অন্তরতম সখারূপে লাভ করিয়া অভয়প্রাপ্ত হইয়াছি।

৯। তুমি রক্ষকদিগেরও রক্ষক। তোমার স্নেহপ্রেমে আমাদিগকে আচ্ছাদিত রাখিয়া আধিব্যাধি হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর।

১০। তুমি আমাদের নিত্যসহচররূপে সর্ব্বদাই পার্শ্বে অবস্থিতি কর। তুমি আমাদের সখা ও সুহৃৎরূপে নিত্য অন্তরে অবস্থিতি কর। যাহাতে আমরা মঙ্গলের পথে ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্রসর হইতে পারি, হে বন্ধু! তুমি আমাদিগকে সেই প্রকার উপদেশ প্রদান কর।

১১। তুমি আমাদের অন্তরে যে শুভবুদ্ধি প্রদান করিয়াছ, তাহা দ্বারাই আমরা জানিতে পারি, কোন্ কার্য্য তোমার প্রিয়। তাহা জানিয়া আমরা তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনেই যেন সর্ব্বদা নিরত থাকি। আমাদের গৃহে তুমি নিত্য সুখশান্তি প্রেরণ কর।

১২। আমরা আমাদের হৃদয়ের সমুদয় প্রীতিভক্তি তোমার চরণতলে নিবেদন করিতেছি। তুমি আমাদের রসনাগ্রে আবির্ভূত হইয়া অগ্নিময় বাক্যে তোমার নামকীর্ত্তন করিবার শক্তি প্রদান কর। তুমিই আমাদের সম্পদবিধাতা প্রভু। তুমি আমাদের ধনসম্পত্তি বর্দ্ধিত কর। তুমি আমাদিগকে আধিব্যাধি হইতে নির্মুক্ত কর। তুমি আমাদের অন্তরে চিরসখার মূর্ত্তিতে নিত্য প্রকাশিত থাক।

১৩। গাভীসকল যেমন সুমিষ্ট শস্পপূর্ণ ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যায় না; গৃহস্থ যেমন সুসজ্জিত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে চাহে না, তুমিও সেইরূপ আমাদের এই সুমার্জ্জিত ও সদ্ভাবসজ্জিত অন্তরাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইও না।

১৪। আমরা তোমাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিয়া এবং তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনের দ্বারা যেন নিত্য তোমার উপাসনা করি। তুমি আমাদের প্রতি তোমার প্রীতি অজস্রধারে বর্ষণ করিতেছ। আমাদের উপাসনায় তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তোমায় বন্ধু বলিবার মহোচ্চ অধিকার দিয়াছ। আমাদের প্রার্থনার বিষয় আর কি আছে?

১৫। আমরা যেন পাপে নিপতিত না হই। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি যেন আমাদিগের দেখিতে না হয়। তোমার অভিশাপ যেন আমরা নিজেদের মস্তকে না ডাকিয়া আনি। তুমি আমাদের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকলই জানিতেছ। তুমি আমাদের অতীতের ভুলভ্রান্তিসকল মার্জ্জনা করিয়া বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে জ্ঞানে ও প্রেমে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমুজ্জ্বল করিয়া তোল।

১৬। তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর। আমরা তোমার সন্তান। আমাদের যেন কখনও অন্নজলের অভাব অনুভব করিতে না হয়। তোমার প্রদত্ত অন্নজল লাভ করিয়া আমরা যেন নিত্যই বলবীর্য্যে পরিপুষ্ট হই।

১৭। তুমি আমাদের সখা ও সুহৃৎ। তোমারই কৃপাবারির সাহায্যে আমাদের দেহ মন ও আত্মা সকল বিষয়েই পরিপুষ্টি লাভ করুক। কিন্তু আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সেই কারণে মদমাৎসর্য্যে অভিভূত না হই।

১৮। তুমি আমাদের শত্রুগণের শত্রুতাকে পরাহত কর। তোমার প্রজাগণের মধ্যে অন্নজল ও বস্ত্র বিতরণে আমাদিগকে সক্ষমতা প্রদান কর। আমাদিগকে তুমি অমর করিয়াছ। আমরা যেন ইহলোকের ন্যায় পরলোকেও তোমারই চরণতলে থাকিবার অধিকার লাভ করি।

১৯। আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধার হবি দ্বারা তোমায় পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তুমি আমাদের সেই পূজা সার্থক কর। তোমার নাম লইয়া আমরা যে কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তোমার অক্ষয় তেজে আমাদের সেই যজ্ঞ উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। তুমি আমাদের প্রতি চিরপ্রসন্ন থাক। আমাদের আয়ুর্বৃদ্ধি হৌক, আমাদের পুণ্যবৃদ্ধি হৌক। তুমিই একমাত্র পাপ-হরণ পরমশরণ। তুমি আমাদের পাপতাপ বিদূরিত কর। আমাদিগকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান, কর এবং বীর ও শূর সন্তান প্রদান কর। তুমি তাহাদিগকে তোমারই সুপথে নিত্যকাল সুরক্ষিত রাখিও এবং তুমি আমাদের গৃহে গৃহদেবতারূপে চিরবিরাজমান থাকিও।

২০। তোমার পথ শ্রেয়ের পথ। যে শ্রেয়ের পথ অবলম্বন করে, তাহার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল লাভ হয়। তাহার গৃহ দুগ্ধবতী গাভী ও ত্বরিতগতি অশ্ব প্রভৃতি দ্বারা শীঘ্রই পূর্ণ হয়। তাহার গৃহ কর্ম্মযজ্ঞের ধ্বনিতে নিত্যই ধ্বনিত হয়। তাহার সন্তানগণ পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান হয় এবং তাঁহাদের নাম সর্ব্বতোভাবে উজ্জ্বল করে।

২১। ধর্ম্মযুদ্ধে তুমি যাহার সহায় হও, কাহারও নিকটে সে পরাজয় লাভ করে না। তুমিই জয়দাতা; তুমিই অক্ষয় সুখদাতা। তোমারই আদেশে অন্নজল আমাদের দেহে বলবিধান করে। তুমিই আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের মধ্যবিন্দু। বিশুদ্ধ ও পবিত্র আত্মাই তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম নিকেতন। তোমার যশ বিশ্বের সর্ব্বত্র সূচিত হইতেছে। তুমি আমাদিগকে সংসারসংগ্রামে বিজয়ী কর।

২২। তুমি ওষধি ও বনস্পতিতে প্রবিষ্ট হইয়া আছ। তুমি জলেতে স্নেহরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমিই জীবজন্তুর প্রাণরূপে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি ভূলোক, দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তোমারই তেজে অন্ধতিমির বিদূরিত হইয়া সমুদয় আকাশ জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

২৩। তোমার বল অপ্রতিহত। তুমি আমাদের সহায় হও, যাহাতে আমরা আমাদের সকল কর্ম্মেই জয়লাভ করিতে পারি। তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমুন্নত হইতে পারি। শত্রুগণের হিংসা হইতে তুমি আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিও না, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না।

উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নাম প্রতিদিন প্রভাতে না লইয়া কোনও কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইবে না। তাঁহারই নাম লইয়া গাত্রোত্থান করিবে, আবার মুখ হাত ধুইয়া স্থিরচিত্তে পবিত্র স্থানে সুখাসনে সমাসীন হইয়া তাঁহার নাম গ্রহণ করিবে, প্রাণের ভিতর বসাইয়া লইবে, তাহার পর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। তাহার ফলে দেখিবে, সমস্ত দিন তোমার মঙ্গলভাবে কাটিয়া যাইবে; তোমার সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইবে; পাপ চিন্তার প্রতি, পাপ কার্য্যের প্রতি তোমার চিত্ত ধাবিত হইবে না; ধাবিত হইলেই ভগবান তোমার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবেন—তুমি আশ্চর্য্য উপায়ে রক্ষা পাইবে। তাঁহার নামের মত মঙ্গলপ্রদ কল্যাণকর আর কিছুই নাই। তাঁহার নামের গুণে সমস্ত দুঃখশোক সকল বিঘ্নবিপত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়, তপ্ত প্রাণে শান্তিধারা বর্ষিত হয়। তাঁহার নাম লইয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মস্তকে তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ শতধারে ঝরিতে থাকিবে।

তিনি স্বপ্রকাশ। তাঁহার সুন্দর প্রকাশ যেমন বাহিরে প্রকৃতির মধ্যে, তাঁহার সুন্দরতর প্রকাশ সেইরূপ মানবাত্মার অন্তরে। অরুণতপন যখন পূর্ব্ব গগন শতবিধ বর্ণে রাঙ্গাইয়া উদয়াচল হইতে বিশ্বজগত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উজ্জ্বল রথে আরোহণ করে; পূর্ণিমা নিশিতে যখন চন্দ্রমা ধরাপৃষ্ঠকে জ্যোৎস্নাধবলিত করে, তখন তাহার ভিতর সাধক সূর্য্যের অন্তরাত্মা, চন্দ্রের অন্তরাত্মা ভগবানেরই আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখেন। বর্ষাগমে যখন পূর্ব্বগগন অন্ধকার করিয়া কৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি দেখা দিয়া কৃষকগণের হৃদয়কে আনন্দে আকুল করে, তখন অগ্নিতে জলেতে ও বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট পরম দেবতা একমাত্র ভগবানেরই মঙ্গলমূর্ত্তি তাহার মধ্য হইতে বিকসিত হইয়া উঠে। যখন যুথি জাতি বেল মল্লিকা প্রভৃতি শুভ্র পুষ্পগুলি বাতাসের সঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া ক্ষণে ক্ষণে

মাথা নাড়িয়া সূর্য্যকিরণের সঙ্গে চাঁদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে লুকাচুরি খেলিতে থাকে, তখন তাহার মধ্যে প্রকৃতির অন্তর্যামী পরম দেবতার প্রকাশ ভিন্ন আর কাহারও প্রকাশ তো দেখা যায় না। আবার যখন মানুষ শুভ কামনা করিয়া তাহাকে সফল করিবার জন্য প্রাণের সহিত ভগবানকে ডাকিয়া সাড়া পায়, তখন তো সে অন্তরে তাঁহারই মঙ্গলমূর্ত্তি জাগ্রত দেখে। মানুষ পাপ-তাপে দগ্ধ হইয়া দুঃখকষ্টের কশাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া তাঁহার চরণে আছড়াইয়া পড়িলে তিনি যখন তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লয়েন, তখন মানুষ অন্তরে তাঁহার জননী-মূর্ত্তি দেখিয়া শতধারে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে থাকে।

দুর্লভ মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছ। মনে রাখিও, ভগবানকে ডাকিবার এমন সুযোগ সহজে পাইবে না। তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার চরণে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রাণ মন ধন নিয়োগ করিয়া তোমার মানবজন্মকে সার্থক করিয়া তোল। সকল ভয়ের যিনি ভয়, যিনি ভয়ানকেরও ভয়ানক, তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর; নিজেকে সেই অমৃতপুরুষের সন্তান বলিয়া উপলব্ধি কর। তোমার হৃদয় হইতে সকল প্রকার ভয় বিদূরিত হউক, তুমি সমস্ত বিভীষিকা পদদলিত কর; তোমার নিকট মৃত্যু অমৃতে পরিণত হউক। মিথ্যার নিকটে মস্তক অবনত করিও না; মৃত্যুর ছায়ায়, নিদ্রা আলস্য প্রভৃতির ক্রোড়ে শয়ান থাকিও না। প্রাণের দেবতার সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত থাক এবং ব্রহ্মানন্দরসপানে আপনাকে বিহ্বল করিয়া তোল।

এই পবিত্র স্থানে, এই পবিত্র সময়ে তাঁহাকে নমস্কার কর। সমস্ত হৃদয়মনের সহিত তাঁহার নাম গান কর। তাঁহার সহিত প্রেমডোরে আবদ্ধ হইলে আমরা পরস্পরও সহজেই প্রেমপাশে আবদ্ধ হইতে পারিব। সেই আনন্দস্বরূপ তোমাতেও আছেন, তিনি আমাতেও আছেন—ইহা অপেক্ষা আমাদের পরস্পরের মধ্যে দৃঢ়তর বন্ধন আর কি হইতে পারে? ব্রহ্মনামকে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তের জপমন্ত্র কর। তাঁহাকে নেতারূপে সম্মুখে রাখিয়া সকল শুভকর্ম্মে হস্তক্ষেপ কর এবং জয়যুক্ত হও; দুঃখ শোক, বিঘ্ন বিপত্তি, পাপ তাপ তোমাদের চতুঃসীমা হইতে পলায়ন করুক।

—

উপাস্য কে?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ। ভগবান আলোচনা করিলেন; আলোচনা করিয়া এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিলেন।

ভগবান যে কি সূত্রে এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিলেন তাহা কেহই জানে না, তাহা আবিষ্কার করিবার শক্তি-সামর্থ্যও কাহারও নাই বা হইতে পারে না। মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হউক না কেন, বিশ্বজগত-সৃষ্টির আদি-কথা কেহই বলিতে পারিবে না—তাহা মানুষের কল্পনারও অতীত। মানুষ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত; বিশ্ব-সৃষ্টির আদিকথা প্রকৃতির বহির্ভূত। সুতরাং প্রকৃতির অতীত কোন মূল তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভগবানই একমাত্র প্রকৃতির অতীত। তিনি যে কি সূত্রে এই বিশ্বজগতকে প্রকৃতির নিয়মে আবদ্ধ করিয়া পরিচালিত করিলেন এবং কি সূত্রে সেই সকল নিয়মাবলী প্রবর্ত্তিত করিয়া এই প্রকৃতিরই জন্মদান করিলেন, তাহার মধ্যে মানুষের প্রবেশ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই কারণে ঋষি নিজের অন্তরে প্রবেশ করিয়া এইটুকু বলিতে পরিলেন যে, ভগবান ধ্যানস্থ হইলেন, আত্মস্থ হইয়া আলোচনা করিলেন এবং তাহারই ফলে এই বিশ্বজগত ও এই বিরাট প্রকৃতি উৎপন্ন হইল। ইহার অধিক কিছু বলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়—বলিতে যাওয়াই ধৃষ্টতা। তিনি যে শক্তি আকাশে বিকশিত করিলেন; তিনি যে প্রাণ, যে জীবনীশক্তি প্রকৃতিতে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন, সেই শক্তি ও সেই প্রাণ অবলম্বনে আশ্চর্য্য প্রণালীতে এই আকাশ শতখণ্ডে বিখণ্ডিত হইয়া লক্ষকোটি সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্রের জন্মদান করিল। সেই সকল সূর্য্যচন্দ্র গ্রহনক্ষত্র আশ্চর্য্য প্রণালীবশে শতসহস্র লক্ষকোটি জীবজন্তুর জন্মদান করিয়া জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির অপূর্ব্ব লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

ভগবানই একমাত্র সত্যস্বরূপ—তাঁহার অস্তিত্বেই জগতের অস্তিত্ব। এক অখণ্ড অস্তিত্বের ভিত্তি না থাকিলে খণ্ড খণ্ড অস্তিত্বের সম্ভাবনাই আসিতে পারে না। তিনিই এই বিশ্বজগতের একমাত্র কারণ। কার্য্যকারণশৃঙ্খলা প্রতি পদে অনুভব করিবার ইচ্ছা আমাদের অন্তরে নিহিত আছে। আমরা যে কোন কার্য্য করি, তাহার কারণ-শৃঙ্খলা খুঁজিতে গেলে সর্ব্বপ্রথম বাহিরের ঘটনাপরম্পরাই আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে কারণশৃঙ্খলারূপে উপস্থিত হয়; কিন্তু প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা কর্ম্মকর্ত্তার ইচ্ছাতে গিয়াই পৌঁছাই। সেইরূপ বেশ করিয়া আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, যে কোনও ঘটনাই হউক, তাহার প্রকৃত কারণের সন্ধানে অগ্রসর হইলে ইচ্ছাসূত্র ধরিয়া একমাত্র ভগবানে গিয়াই পৌঁছিতে বাধ্য হই। তিনি শুধু বহির্জ্জগতের কারণ নন; তিনি আমাদের অন্তরেরও প্রভু এবং মনেরও নিয়ন্তা। তিনি জাগ্রত জীবন্ত দেবতা। তিনি রাজগণেরও রাজা; তিনি অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্ম। অধর্ম্ম যখন পরাক্রম প্রদর্শন করে এবং

ধর্ম্মকে পরাভূত করিতে উদ্যত হয়, তখন তিনি স্বীয় রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি সন্দর্শনে পৃথিবী ভয়ে ও ত্রাসে শতধা বিভগ্ন হয়। তখন পাপাচারী অসাধু নরনারীগণ তাঁহার সেই রুদ্রতেজ সহ্য করিতে না পারিয়া মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না; এবং পুণ্যাত্মা সাধুসকল তাঁহার প্রসন্ন মুখ সন্দর্শনের অধিকার লাভ করিয়া আনন্দে উল্লসিত হন। তাঁহাকে ছাড়িয়া যে দূরে থাকিবার বৃথা চেষ্টা করে, সে অজ্ঞান ভারবাহী পশুর ন্যায় সংসারে বিচরণ করে।

তিনিই সকল দেবতার পরম দেবতা। এই দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্টি করিবার শক্তি তিনি ভিন্ন আর কেহই ধারণ করিতে পারে না। তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কোনও দেবতাকে সমস্ত হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়া হৃদয়মনকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করিও না—নিজের অধোগতি, নিজের ক্ষুদ্রতা, নিজের বিনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। তাঁহার স্বাভাবিক শক্তিতেই তিনি এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারই প্রেমের নিশ্বাসে এই বিশ্বজগত নিশ্বসিত হইয়াছে। তাঁহারই প্রাণশক্তির অনুপ্রাণনে এই বসুন্ধরা জীবজন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং প্রাণীগণের কলকলধ্বনিতে মুখরিত হইতেছে। এই বিশ্বজগতে তিনি তাঁহার জ্ঞানের যে একবিন্দু দান করিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানসিন্ধুতে পরিণত হইয়া সর্ব্বত্র, বিশ্বজগতের প্রতি অণুপরমাণুতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—মানব তাহারই আবার এক একটী কণামাত্র উদ্‌ঘাটিত করিতে গিয়া যুগযুগান্তর অতিবাহিত করিতেছে।

তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত নিয়মে জ্যোতিষ্কমণ্ডল ছন্দে ছন্দে পরিভ্রমণ করিয়া দিনরাত্রি ঋতু পক্ষ মাস সম্বৎসর প্রভৃতি কালবিভাগসকল প্রবর্ত্তিত করিতেছে। তাঁহারই নিয়মে সূর্য্যের ন্যায় জলন্ত অগ্নিগোলক হইতেও এই শস্যশ্যামল শোভনসুন্দর পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারই নিয়মে সাগর হইতে বাষ্পসকল সমুত্থিত হইয়া আকাশে মেঘের আকারে দেখা দেয়, আবার সেই মেঘ হইতে তাঁহারই স্নেহপ্রেম বারিধারায় নামিয়া আসিয়া জীবজন্তু নরনারী সকলকেই ভক্তিরসে অভিভূত করিয়া ফেলে। ঘনকৃষ্ণ মেঘের ভিতর যেমন চকিতের মত বিদ্যুৎ প্রকাশিত হইয়া চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ ভগবানও আমাদিগের অন্তরে জাগরণ আনিবার জন্য মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন। তাঁহারই ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং তাঁহারই ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে। ন তস্য প্রতিমা অস্তি—তাঁহার প্রতিমা কে জানে যে, সে তাহা সংগঠন করিবে? নিজে অনন্তস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ না হইলে সেই অনন্তস্বরূপ পরমপুরুষকে পূর্ণরূপে ধারণা করিতে কে সক্ষম হইবে? তাঁহার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া মন প্রতিনিবৃত্ত হয়, বাক্য স্তব্ধ হইয়া যায়। কল্পনাবলে তাঁহার প্রতিমা গড়িতে যাওয়া বা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করা বৃথাকার্য্যে জীবন অতিবাহিত করার অধিক কিছুই নহে। জাগ্রত জীবন্ত দেবতা পরম পিতামাতা পরম পুরুষের পূজা ব্যতীত জীবনলাভের, প্রকৃত মুক্তির দ্বিতীয় কোনও পন্থা নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তিনি সর্ব্বব্যাপী। তাঁহা হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা করা বৃথা। পাপ করিলে, দোষ করিলে স্বভাবতই তাঁহা হইতে লুকাইয়া পড়িতে ইচ্ছা হয় বটে; তাঁহার রুদ্রদণ্ড উত্তোলিত দেখিলে এমন কে আছে যে সেই দণ্ডের ভয়ে লুকাইবার স্থান অন্বেষণ করে না? কিন্তু লুকাইবার স্থান তো নাই, আর লুকাইয়া লাভও নাই। তাঁহার রাজ্যও যেমন সর্ব্বত্র, সেইরূপ তাঁহার মঙ্গলদৃষ্টিও সর্ব্বত্র প্রসারিত। তিনি যেমন আমাদের পাপের দণ্ডদাতা, সেইরূপ তিনি আমাদের প্রত্যেককে তাঁহার স্নেহপ্রেমের অচ্ছেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহা হইতে দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া কোনই লাভ নাই। বরঞ্চ, তাঁহারই চরণে গিয়া আছড়াইয়া পড়, অনুতাপের অশ্রুবারিতে তাঁহার চরণ ধুইয়া দাও—দেখ, অন্তরে কি অনুপম শান্তি লাভ কর—সমস্ত জীবন গুরু পাপভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আশ্চর্য্যরূপে লঘু হইয়া উঠিবে।

তাঁহার আসন সর্ব্বত্র। কোটী কোটী রবিশশীগ্রহতারকমণ্ডিত দ্যুলোকে যাও, সেখানেও তিনি; লক্ষকোটী ওষধি বনস্পতিশোভিত, লক্ষবিধ জীবজন্তু-সমন্বিত এই ভূলোকেরই প্রতি বা দৃষ্টি কর, সেখানেও তিনি। গগনস্পর্দ্ধী মেঘচুম্বী হিমালয়ের উন্নততম শিখরে উঠিয়া যাও, সেখানেও তিনি; অতলস্পর্শী সাগরগর্ভে নামিয়া যাও, সেখানেও তিনি। কনকতপনের উদীয়মান অরুণমহিমার মধ্যেও তিনি; সূর্য্যের অস্তমিত মহিমার মধ্যেও তিনি। তাঁহার হস্তে তোমার জীবনতরীর হালটী নির্ভয়ে ছাড়িয়া দিয়া কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়—তিনিই তোমাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিবেন। তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিয়ত তৎপর হও, তাঁহার প্রসন্ন মুখ তোমাকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিবে। বিপদের অন্ধকার তোমাকে শতবার আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিলেও বিফল হইবে। সমস্ত অন্ধকার অপসারিত করিয়া দিয়া সেই প্রেমসূর্য্য তাঁহার অপূর্ব্ব জ্যোতিতে প্রকাশ পাইবেন। শত অন্ধকার তাঁহাকে আমাদের দৃষ্টি হইতে চিরকালের জন্য কিছুতেই প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারে না। শত অন্ধকার তাঁহার দৃষ্টি হইতেও আমাদের কোনও

কর্ম্ম, কোনও চিন্তা বা কোনও ভাব লুকাইয়া রাখিতে পারে না।

তিনি আমাদের স্রষ্টা। তাঁহা হইতেই আমাদের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই আমাদের স্থিতি। তিনিই কেবল বরণীয়। তাঁহার সমানও কেহ নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠতরও কেহ নাই। তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তিনি যদি শুদ্ধ ও পবিত্র না হইতেন, তবে বিশুদ্ধতার প্রতি পবিত্রতার প্রতি জগতের এত আকুলতা আসিত না। তিনিই আমাদের বরণীয়, তিনিই আমাদের নমস্য। তিনিই সকল ভয়ের ভয় এবং ভয়ানকেরও ভয়ানক। তাঁহাকে ছাড়িয়া অপর কোন্ দেবতার চরণে আমাদের শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করিতে ধাবিত হইব? অন্তরে বাহিরে তাঁহার ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া দেখি এবং তাঁহারই নামে জয়ধ্বনি করিয়া কৃতার্থ হই। আমরা তাঁহাকে ভজনা করি, আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।

ভগবানকে যদি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে অন্তরকে পাপনির্মুক্ত কর। সেই অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর; ভক্তিজলে অন্তরাত্মার আসন সুপরিষ্কৃত কর, তোমাদের অজ্ঞানতই তিনি স্বয়ং আসিয়া তোমাদের আত্মাকে অধিকার করিয়া বসিবেন এবং তোমাদিগকে আনন্দদানে উৎফুল্ল করিবেন। তিনি আমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহারেই আমাদের শুভ ও মঙ্গল, এবং তাহার অসঙ্গত ব্যবহারেই আমাদের অমঙ্গল ও অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। যাহা অমঙ্গল ও অকল্যাণ আনয়ন করে, তাহাই পাপ। সুতরাং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তাঁহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্ত পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেও পারেন না, পাপচিন্তাও করিতে পারেন না। যদি দৈবাৎ তিনি কোন পাপাচরণ করেন, পদ্মপত্রে জলের ন্যায় সেই পাপও তাঁহার অন্তরে লাগিয়া থাকে না, সেখানে একটুও চিহ্ন রাখিতে পারে না; ভগবানের মঙ্গল বিধানেই তাহা নিশ্চিহ্নরূপে বিধৌত হইয়া যায়।

অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দেখ, দেখিবে, তিনিই সমস্ত পুণ্যের, সমস্ত মঙ্গলের, সমস্ত কল্যাণের একমাত্র উৎস। সেই অখণ্ড উৎস হইতে এই সংসারের সর্ব্ববিধ পুণ্য, কল্যাণ ও মঙ্গল শতধারে উৎসারিত হইয়া বিশ্বসংসারকে আশ্চর্য্যরূপে সিক্ত রাখিয়াছে। কেবল তুমি আমি নয়, জগতের যে কোন ভক্ত অন্তরে দৃষ্টি দিয়াছেন, তিনিই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন। পর্ব্বতসকল যেমন ধ্রুব, এই পৃথিবী যেমন ধ্রুব, সেই মঙ্গলস্বরূপ পিতামাতা পরমেশ্বর আমাদের তদপেক্ষা ধ্রুবতর আশ্রয়স্থান। তিনিই আমাদের একমাত্র পরম আশ্রয়। আমোদ আহ্লাদ করিতে হয়, তাঁহাকেই কেন্দ্রে রাখিয়া কর—দেখিবে, তাহা আরও সুমিষ্ট লাগিবে। দুঃখ-শোক আসিয়া যদি তোমাকে কঠিন আঘাত করে; অশ্রু যদি উছলধারে তোমার গণ্ড বহিয়া ঝরিতে চায়, তবে সে সমস্তই তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দিও—দেখিবে, সেই আঘাতের প্রবল বেগ প্রতিহত হইবে এবং সেই অশ্রুবন্যা প্রতিরুদ্ধ হইবে। ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনের দ্বারা এবং তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি দিয়া তাঁহার উপাসনা কর, পুণ্য অর্জ্জন কর, পবিত্রতা অর্জ্জন কর, তাঁহার সংস্পর্শলাভের অধিকারী হও, দেখিবে, তোমার দেহে কি শক্তি আসে, তোমার মনে কি বল আসে এবং তোমার আত্মায় কি তেজ আসে। পাপকে দূরে রাখিলে পবিত্রতাসূত্রে আপনাকে ভগবানের সহিত সমধর্ম্মিতায় আবদ্ধ করিলে, উপলব্ধি কর যে, তুমি সেই অপ্রতিহতশক্তি বিশ্বপতির সন্তানের আসন গ্রহণ করিলে। তখন তোমার শক্তি, তোমার বল প্রতিহত করে কাহার সাধ্য? তখন তুমি সংসারে ত্রিলোকজয়ী হইয়া বিচরণ করিতে সক্ষম হইবে নিঃসন্দেহ। তখন তোমার সমস্ত কার্য্যই মঙ্গলপ্রসূ ও মধুময় হইয়া উঠিবে। সুরনর সকলে ভগবানের নামে বিজয়ধ্বনি করিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমারও নামে মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া দিকদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিবে। *

কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার। (২)

(শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম-এ, বি-এল)

মহাভারতের অপরাপর কতকগুলি ঘটনা মনোযোগ দিয়া আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, পাণ্ডুর দেহান্তরকালে হস্তিনার কুরুসিংহাসনে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠের কোনই দাবী ছিল না; এবং ভীষ্ম বাহ্লিক প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধগণ বা প্রজাপুঞ্জও কেহই পাণ্ডবজ্যেষ্ঠের কোনও দাবী স্বীকার, সমর্থন বা উত্থাপন পর্য্যন্ত করেন নাই। এই ঘটনাগুলি কয়েক ভাগে বিভক্ত করা গেল; যথা :—

(ক) পাণ্ডুর দেহান্তকাল হইতে তৎপুত্রগণের হস্তিনাগমনকাল পর্য্যন্ত।

(খ) পাণ্ডবগণের হস্তিনাগমন-কালের পর ও :—

  (অ) বাল্যক্রীড়াকালে

  (আ) রঙ্গক্রীড়াস্থলে

  (ই) রঙ্গক্রীড়াস্থলে পরীক্ষার পর যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্য প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত।

উপরি-উক্ত ঘটনাগুলি এবার একে একে আলোচনা করা যাক।

---

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বিবৃত।

(ক)

পাণ্ডুর দেহান্তকাল হইতে তৎপুত্রগণের হস্তিনাগমন-কাল পর্য্যন্ত।

পাণ্ডু পরলোক গমন করিলে সপ্তদশ দিবস পরে তাপসগণ তদীয় ও তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রীর মৃতদেহ, কুন্তী ও পাণ্ডবপঞ্চক সমভিব্যাহারে হস্তিনায় আগমনপূর্ব্বক তৎসকল ভীষ্ম বাহ্লিক ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি কৌরবগণকে সমর্পণ করতঃ প্রস্থান করিলেন। কৌরবাদি কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণ গৃহীত হইলে পর ভীষ্ম-ধৃতরাষ্ট্রাদি পাণ্ডু ও মাদ্রীর সৎকার ও শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিলেন। (মহাভারত, আদি, সম্ভব ১২৫ অধ্যায়)।

তাপসগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণ সকলের পরিচিত হইলে পর কৌরব ও পুরবাসী সহর্ষে সকলেই মহাকোলাহল করিতে লাগিল। তন্মধ্যে "কেহ কেহ কহিল তাঁহারাই বটে; কেহ কেহ বলিল বহুকাল হইল পাণ্ডু রাজা লোকান্তরিত হইয়াছেন, সুতরাং ইহারা তাঁহার পুত্র ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে।" (মহাভারত আদি অনুক্রমণিকাধ্যায়)।

যৎকালে তাপসগণ উক্তরূপে পাণ্ডুর মৃতদেহ ও তৎপুত্রাদি সহ হস্তিনা গমন করেন ও ধৃতরাষ্ট্রাদি তাঁহাদিগকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তৎকালে উক্ত কৌরবগণমধ্যে—"বিচিত্রাভরণ-বিভূষিত" দুর্য্যোধনের প্রথম সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি। (মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১২৬ অধ্যায়)। মহাভারতকার কর্ত্তৃক এস্থলে দুর্য্যোধনের আভরণের উল্লেখ এরূপ বিশেষভাবে করিবার তাৎপর্য্য কি? ইহা কি রাজোচিত অথবা রাজপুত্রের অর্থাৎ "নরপতি" ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রের মর্য্যাদা উপযোগী আভরণের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত?

(খ)

পাণ্ডবগণের হস্তিনাগমন-কালের পর

মহাভারতে দেখা যায় যে পাণ্ডবগণের হস্তিনায় প্রথম পদার্পণ-কালে ও তৎপরেও বহুদিন ধৃতরাষ্ট্রই হস্তিনার সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং দুর্য্যোধন সম্ভবতঃ উক্ত সময় মধ্যে যুবরাজ বা রাজক্ষমতা পরিচালনে অধিকারী ছিলেন। ইহাতে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম-বাহ্লিকাদি বা প্রজাগণ কেহই প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করেন নাই এবং এইরূপ অবস্থা বা ব্যবস্থাই তাঁহারা মানিয়া লইয়াছিলেন—মায় পাণ্ডবগণও। কেন?

পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের যদি কুরুসিংহাসনে কোনরূপ ন্যায্য দাবী বা অধিকার থাকিত, তাহা হইলে কি ভীষ্মাদিপ্রমুখ কুরুপ্রধানগণ তথা প্রজাগণ পাণ্ডবগণের হস্তিনাগমন কালের অব্যবহিত পরই যুধিষ্ঠিরকে কুরুসিংহাসন দান করিতেন না?

যদি উক্ত হয় যে যুধিষ্ঠির তৎকালে অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সিংহাসন দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে সেকথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। যেহেতু কুরুরাজ্যপ্রহরী ভীষ্ম তৎকালে জীবিত ছিলেন, তিনিই পাণ্ডবগণের পিতামহ চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য উভয় ভ্রাতার নাবালক অবস্থায় এবং তৎপরে পাণ্ডবগণের পিতা পাণ্ডুর শৈশবেও প্রায় দুই-তিন পুরুষ যাবৎ নাবালক রাজার অছিরূপে কুরুরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব নাবালক যুধিষ্ঠির রাজা হইলেও ভীষ্মই অবশ্য তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিতেন, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র রহিতে পারে না।

হস্তিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পরও যে বহুকাল অবধি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ সিংহাসন বা রাজ্য প্রাপ্ত হ'ন নাই বা তৎস্বপক্ষে দাবীও কখনও কেহ উত্থাপন পর্য্যন্ত করেন নাই, তাহার দুইটি সম্ভব কারণ হইতে পারে।

একটি কারণ উপরে "ক" হইতে দৃষ্ট হইবে যে তাঁহাদের জন্ম সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান ছিলেন। এমন কি, রঙ্গক্রীড়াস্থলে সমাগত ভারতবর্ষীয় নিখিল ক্ষত্রিয়গণের ও অপর সকলের সম্মুখে যখন দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে বিদ্রূপ করতঃ বলিয়াছিলেন—"আর তোমাদিগের যেরূপ জন্মলাভ হইয়াছে তাহা আমাদিগের অগোচর নাই" (মহাভারত আদি, সম্ভব ১৩৭ অধ্যায়), তখন সে কথার প্রত্যুত্তর করিতে পাণ্ডবগণ কেহ সক্ষম হন নাই। দ্বিতীয় কারণটি এই যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বা সিংহাসনপ্রাপ্তিতে বাধা ছিল বলিয়াই তিনি কুরুরাজ্য বা সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই—ধৃতরাষ্ট্রই তাহা ভোগ ও দখল করিতেছিলেন; ইহাতে কেহই আপত্তি করেন নাই, আপত্তি করিবার কোনও সঙ্গত কারণ প্রাপ্ত হন নাই বলিয়াই আপত্তি করেন নাই।

পাণ্ডবগণের হস্তিনাগমনকালে বা তৎপরে দুর্য্যোধনের যুবরাজত্ব বা রাজক্ষমতাদি পরিচালনে অধিকারীত্ব সম্বন্ধে উপরে বলা হইয়াছে একণে তদ্বিষয়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এস্থলে উল্লেখযোগ্য, যথা :—

(অ) বাল্যক্রীড়াকালে

দুর্য্যোধনের আদেশে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসনবিরচিত ও কম্বল নির্ম্মিত বিচিত্র গৃহসকল প্রস্তুত করান হয়। (মহাভারত—আদি, সম্ভব, ১২৮ অধ্যায়)।

ভীমকে বিষপ্রদানকালের পর ও ভীমের সর্পালয় হইতে প্রত্যাগমনের পর বিদুর, কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণের দুর্য্যোধনভীতি ও তজ্জন্য নীরবে অবস্থান। (ঐ, ঐ—১২৯ অধ্যায়)। তৎকালে বিদুর কুন্তীকে বলিয়াছিলেন যে, পরিণামে যদি আপনার মঙ্গল চাও তবে ও কথা (দুর্য্যোধনের অত্যাচারের কথা) আর মুখে

আনিও না, দুরাত্মা দুর্য্যোধন তোমার একথার সূত্র শুনিতে পাইলে অতিশয় উপদ্রব করিবে। এই উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া পাণ্ডবেরা ও কুন্তী নীরবে রহিলেন।

এস্থলে কয়েকটি কথা প্রণিধানযোগ্য। একটি কথা এই যে, পাণ্ডবগণ বিদুরের কাছেই অভিযোগ করিয়াছিলেন, ভীষ্মাদির নিকট নহে। অপর কথাটি এই যে, অনিষ্ট বা উপদ্রব করিবার ক্ষমতা বা প্রতিপত্তি তৎকালে দুর্য্যোধনের যাহা ছিল, তাহা যুধিষ্ঠির বা পাণ্ডবগণের ছিল না। রাজশক্তি হাতে না থাকিলে এমন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা কি থাকিতে পারে যে একই বংশীয় একজন রাজকুমার অন্য রাজকুমারকে এরূপ ভয় করিয়া নীরবে রহিবে?

(আ) রঙ্গক্রীড়াস্থলে।

রাজকুমারেরা রাজা বা রাজপুত্র ব্যতীত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবেন না, আচার্য্য কৃপ ইহা প্রকাশ করায় তদ্দণ্ডেই দুর্য্যোধন কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের শূন্যসিংহাসনে অভিষেক করেন। (মহাভারত —আদি, সম্ভব ১৩৬ অধ্যায়)।

এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে তৎকালে দুর্য্যোধন রাজশক্তি বা ক্ষমতা-পরিচালন করিতেন, এমন কি রাজ্যাংশও যথেচ্ছ দান করিতে ক্ষমতাবান ছিলেন; এবং তাঁহার এবম্প্রকার ক্ষমতাপরিচালনকার্য্য অন্য সকলেই এমন কি পাণ্ডবেরাও শিরোধার্য্য করিয়া লইতেন, তাহাতে অন্য কেহ বা পাণ্ডবেরাও আপত্তি করেন নাই।

আচার্য্য কৃপের উক্ত উক্তির পরই তদানীন্তন অবস্থায় দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করার অর্থই প্রকাশ্যে অপরকে বিশেষতঃ পাণ্ডবগণকে সমরে আহ্বান বা challenge করা। দুর্য্যোধনও একথা অল্প পরেই পরিষ্কার ভাষায় কহিয়াছিলেন,— "ইনি (কর্ণ) মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও মদীয় সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন।" "কর্ণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যাহার বিদ্বেষ থাকে তিনি সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হউন।" এই কথা বলার পর "মহারাজ দুর্য্যোধন" কর্ণের করগ্রহণ পূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্মসমভিব্যাহারে স্বস্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। কেহ আর কোনই বাঙ্নিষ্পত্তি বা উচ্চবাচ্যই করিলেন না।

উক্ত উদ্ধৃতাংশে দুইটি ঘটনা লক্ষ্যযোগ্য। প্রথম ঘটনা—কর্ণকে রাজ্যদান ব্যাপারে ভীষ্ম দ্রোণ বা অন্য কেহ, এমন কি পাণ্ডবেরাও কেহ কোন বাঙ্নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত করিলেন না ও ভীষ্মদ্রোণাদিসহ যে যাহার নিজ নিজ ঘরে পলায়ন করিলেন। দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, এইস্থলে দুর্য্যোধনকে "মহারাজ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ দুর্য্যোধন এই সময় ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ও অপ্রতিহতভাবে রাজক্ষমতা পরিচালন করিতেন।

দুর্য্যোধন যে এই সময়ে "মহারাজ" বা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন অথবা এইরূপ অপ্রতিহত ভাবে রাজক্ষমতা পরিচালন করিতেন, পাণ্ডবগণের বা যুধিষ্ঠিরের যদি কিছু ন্যায্য দাবী থাকিত তবে ভীষ্মাদি, এমন কি পাণ্ডবেরাও তাহাতে কোনও আপত্তি পর্য্যন্ত করেন নাই কেন? যুধিষ্ঠিরের দাবীই বা উত্থাপিত হয় নাই কেন? পাণ্ডবগণের একান্ত পক্ষপাতী বিদুরও কেন সেরূপ দাবী উত্থাপন করেন নাই? এমন কি তিনি পর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের ভয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন কেন? পাণ্ডবগণের বা যুধিষ্ঠিরের যদি কুরুসিংহাসনে কোনও ন্যায্য দাবী থাকিত, তাহা হইলে প্রজাকুলই বা নীরব ছিল কেন এবং তাঁহাদেরই বা এরূপভাবে "মাথা হেঁট" করিয়া থাকিবার কি দরকার ছিল?

উক্ত উদ্ধৃতাংশে দুর্য্যোধনবাক্যমধ্যে যে "মদীয় সাহায্য" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে এবং উহাতে দুর্য্যোধনের স্বীয় ক্ষমতার প্রতি যে ইঙ্গিত আছে, সে ক্ষমতা কি? উহা কি মাত্র একজন রাজকুমারের শারীরিক ক্ষমতা অথবা দুর্য্যোধনের অধিকৃত ও পরিচালিত রাজক্ষমতা? শারীরিক ক্ষমতায় মধ্যম পাণ্ডব ভীম যে দুর্য্যোধন অপেক্ষা কিছু কম ছিলেন, তাহা মনে হয় না এবং রঙ্গক্রীড়া বা পরীক্ষা স্থলে ভীমই দুর্য্যোধনের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয় যে শেষোক্ত কথাই ঠিক অর্থাৎ "মদীয় সাহায্য" শব্দ ব্যবহার দ্বারা দুর্য্যোধনের রাজক্ষমতা (যাহা তৎকালে পাণ্ডবদের ছিল না) বা তৎপ্রতিই ইঙ্গিত মাত্র।

(ই) রঙ্গক্রীড়া স্থলে পরীক্ষার পর যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্য প্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত।

উক্ত পরীক্ষার পর দ্রোণাচার্য্য কুরু ও পাণ্ডব শিষ্যবর্গের নিকট গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণা—দ্রুপদরাজার রাজ্য আক্রমণ ও রণস্থল হইতে তাঁহাকে বন্দীভাবে দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনয়ন। (মহাভারত আদি সম্ভব ১৩৮ অধ্যায়)। দ্রোণশিষ্যগণ গুরুর এই বাসনা পূরণ করতঃ দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরে সম্বৎসর অতীত হইলে সম্ভবতঃ জনমত দৃষ্টে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। (ঐ, ঐ, সম্ভব—১৩৯ অধ্যায়)।

এই যৌবরাজ্যে অভিষেক ঘটনায় কি বুঝিতে হইবে? যুবরাজ শব্দের দুইটি অর্থ। একটি অর্থ, যুবক

রাজা Young King অর্থাৎ যিনি যৌবনাবস্থায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। অপর অর্থ, সিংহাসনাধিষ্ঠিত রাজার অধীনে যিনি যুবরাজ অর্থাৎ Crowned Prince হন বা ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন মাত্র। যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্য-প্রাপ্তির অর্থ আমার মনে হয় এই যে, তিনি ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন মাত্র; যুবরাজত্ব পাইলেও তিনি রাজ্য, সিংহাসন বা বিশেষ কোনই ক্ষমতা লাভ করেন নাই।

যুধিষ্ঠির যুবরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার অপেক্ষা দুর্য্যোধনের ক্ষমতাদি বেশি ছিল; কারণ, ইহার পরেও দেখা যায় যে যুধিষ্ঠির যুবরাজ থাকা কালেও "সমুদায় ধন ও অমাত্যবর্গ" দুর্য্যোধনেরই অধীন ছিল। (মহাভারত আদি, জতুগৃহ, ১৪২ অধ্যায়)।

এই স্থলে কয়েকটি ভাবিবার কথা আছে। কুরুরাজ্যে ও সিংহাসনে যদি ধৃতরাষ্ট্রের স্বত্ব স্বামিত্বাদি না ছিল, তবে তিনি কিরূপে যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন? ফলতঃ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্য গ্রহণ দ্বারাই তৎকালে রাজ্যে বা সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্রের অধিকারিত্ব যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হয় নাই কি? যুধিষ্ঠির ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তৎকালে সিংহাসন পাইলেন না কেন? তিনি যৌবরাজ্য পাইলেও কি হেতু ধৃতরাষ্ট্র বা দুর্য্যোধনই সিংহাসনে আসীন রহিলেন? তাহাতে ভীষ্মাদি কুরুবর্গই বা কেন যুধিষ্ঠিরকে একেবারেই সিংহাসন দান করিবার ব্যবস্থা করেন নাই?

আমার মনে হয়, কুরুরাজ্য ও সিংহাসনপ্রাপ্তির পথে যুধিষ্ঠিরের যে অন্তরায়ের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তজ্জন্যই তৎকালেও সে কথা কেহ উত্থাপনও করেন নাই।

যদি এই সকল সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কাহারও কোনও সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে তবে তাঁহাকে আমি মহাভারতের আদি পর্ব্বান্তর্গত ২০৩ অধ্যায়টি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তথায় দৃষ্ট হইবে যে স্বয়ং সত্যসন্ধ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের দাবী যে ধর্ম্মসঙ্গত তাহা স্বীকার করতঃ কহিয়াছেন—'ইহা (কুরুরাজ্য) তাহাদিগেরও পৈত্রিক রাজ্য। বৎস দুর্য্যোধন! তুমি যেমন মনে করিতেছ ইহা আমার পৈত্রিক রাজ্য পাণ্ডবেরাও সেইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যেমন তুমি ধর্ম্মতঃ রাজ্যলাভ করিয়াছ"—ইত্যাদি। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে ভীষ্ম কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, দুর্য্যোধন যে কুরুরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন তাহা—(১) তাঁহার অর্থাৎ দুর্য্যোধনের পৈত্রিক এবং (২) দুর্য্যোধন উহা ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন—অন্যায় বা অধর্ম্ম করিয়া নহে। পূর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যপ্রাপ্ত না হইলে তাহা দুর্য্যোধনেরও পৈত্রিক রাজ্য বলিয়া কি প্রকারে ভীষ্ম কর্ত্তৃকও স্বীকৃত হইতে পারে?

বর্ত্তমান আলোচনা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীত হইবে যে, পাণ্ডুর পরে ধৃতরাষ্ট্রই দায়সূত্রে কুরুরাজ্য ও সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট দুর্য্যোধন উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং মূলতঃ কুরুসিংহাসনে দাবী ন্যায্য ছিল দুর্য্যোধনেরই, যুধিষ্ঠিরের নহে। কুরুরাজ্য ও সিংহাসনে দুর্য্যোধনের দাবী অন্যায় বলিয়া সাধারণতঃ দুর্য্যোধনের প্রতি যে দোষারোপ করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ভুল।

অন্যান্য জাতির প্রতি ন্যায়পরতা

(জনৈক শিক্ষক)

এমন অনেক বিষয় আছে, যে সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা জগতের অন্যান্য জাতি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। ভগবান অনন্তস্বরূপ। তাঁহার রাজ্য অনন্ত। চিন্তা বল, ভাব বল, শক্তি বল, সমস্তই তো সেই অনন্তস্বরূপ হইতেই নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এপ্রকার মনে করা নিতান্তই ভুল যে, আমরাই সেই অনন্তস্বরূপের সমস্ত শক্তি জ্ঞান ও ভাব আয়ত্ত করিয়া সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছি। এসিয়ার মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে ভারতে প্রতিবেশীস্বরূপে বিভিন্ন দেশ দেখা যায়—তন্মধ্যে আফগানিস্থান, তিব্বত, চীন, জাপান রাশিয়া প্রভৃতি কয়েকটী দেশ বেশী পরিচিত। ইহাদের পোষাকপরিচ্ছদ, আচারব্যবহার বা সৌধ প্রভৃতির নির্ম্মাণপ্রণালী আমাদের হইতে কত ভিন্ন। ঐসকল জাতি আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ—জাপানীগণ সকল কার্য্য নিপুণভাবে করা বিষয়ে কাহারও পশ্চাতে পড়িয়া নাই; চীনবাসী সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে যে কিরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই; আফগানগণ কত সাহসী, তাহা আমরা সকলেই জানি; তিব্বতীয়গণ যে কিরূপ শ্রমসহিষ্ণু, তাহা আমরা তিব্বত-পর্য্যটকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে দেখি। সেইরূপ ইউরোপের মধ্যেও অনুসন্ধান করিলে দেখি যে, ফরাসিগণ ভদ্রতায়, সৌন্দর্য্যবোধে এবং sobriety বিষয়ে ইংরাজ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ; নিখুঁত ভাবে কাজ কর্ম্ম করায় এবং গীত-বাদ্যে জার্ম্মানগণ, এবং ডচগণ পরিচ্ছন্নতায় ইংরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এদেশে ৪ কড়ায় এক গণ্ডা, ২০ গণ্ডায় এক পণ, ১৬ পণে এক কাহন, এইভাবে টাকাপয়সা গণিবার রীতি প্রচলিত আছে—এক কাহনের ভিতর কত বিভিন্ন প্রকারে গণিবার ব্যবস্থা আছে; ইংলণ্ডেও এই প্রকার এক পাউণ্ড গণনা করিতে গেলে ৪ ফার্দিঙ্গে এক

পেনি, ১২ পেনিতে এক শিলিং এবং ২০ শিলিঙ্গে এক পাউণ্ড গণিত হয়। এই প্রকার তিন-চার প্রকার ভাগ মনে রাখা যে কি প্রকার কষ্টকর তাহা শিশুদিগকে অঙ্ক শিখাইতে গেলেই ধরা পড়ে। কিন্তু ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে দশমিক বিভাগ প্রচলিত আছে, তাহা খুবই সুন্দর ও সহজ—মনে কর, যদি এই প্রকার ভাগ করি যে, এক কাহনে দশ পণ, ১ পণে ১০ গণ্ডা এবং ১ গণ্ডায় ১০ কড়া, তাহা হইলে শিশু শিক্ষার্থীদিগের উহা মনে রাখা কত সহজ হয়। তাই বলিয়া আমরাও যে যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছি, সেই সেই বিষয়ে আপনাদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া মিথ্যা বিনয়েরও কোন প্রয়োজন নাই। ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন, আয়ুর্ব্বেদ, গণিত প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ভারতবর্ষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভাব বহুকাল যাবৎ দাঁড়াইয়া আছে যে, আমরা অর্থাৎ হিন্দু ব্যতীত জগতের অন্যান্য জাতি ম্লেচ্ছ অর্থাৎ অস্পৃশ্য। কিন্তু অন্যান্য জাতিসমূহের নানাবিষয়ক শ্রেষ্ঠতা স্মরণ করিয়া এই অন্যায় গর্ব্বের ভাব আমাদের অন্তর হইতে বিদূরিত করা উচিত।

অন্যান্য অনেক জাতি যে ভারতবাসীর সহিত একাত্মতাসূত্রে সম্বদ্ধ তাহা ঐ সকল জাতির ভাষা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। এই যে অন্যান্য জাতিকে আমরা ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করি, ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, তাহার কারণ, আমরা পরস্পর পরস্পরের ভাষা জানি না পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে পারি না। ফরাসি, জার্ম্মান প্রভৃতি ভাষায় কথোপকথন শুনিলে বা গ্রন্থাদি পাঠ করিতে গেলে মনে হয় বটে যে, ঐ সকল ভাষা আমাদের ভাষা হইতে কত ভিন্ন। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মানবজাতি মূলে একই পরিবারভুক্ত ছিল; পরে প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেশে চলিয়া গিয়া বিভক্ত হইয়া পড়ার কারণে আচারব্যবহারের ন্যায় ভাষারও বিভিন্নতা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা আর্য্যজাতিগণের ভাষাসমূহ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া উঁহাদের পরস্পরের মূলগত ঐক্য প্রকাশ করিয়াছেন।

সংস্কৃত	বাংলা	ল্যাটিন	ইংরাজী	জার্ম্মান
পিতা	পিতা	Pater	Father	Vater
ভ্রাতা	ভ্রাতা		Brother	Bruder
মাতা	মাতা		Mother	

আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, যাহা হইতে বিভিন্ন জাতিকে একই মূল জাতির বিভিন্ন শাখারূপে দেখানো যাইতে পারে। যেমন বিভিন্নব্যক্তিগণের মধ্যে, সেইরূপ বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যেও বৃথা দ্বন্দ্ববিবাদ আসিতে দিতে নাই; যদি বা আসে, তবে সালিসি দ্বারা যতদূর সম্ভব আপোষে মিটাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণে সকল দেশেই সকল জাতির মধ্যেই সালিসির গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। যে কোন দ্বন্দ্ববিবাদ, যুদ্ধকলহের বিষয় আলোচনা কর, দেখিবে, তাহার ফলে কত নরহত্যা, কত অর্থনাশ, কত অনিষ্ট অমঙ্গল জগতকে সমাচ্ছন্ন করে। ভগবান বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে বিভিন্ন জাতিসমূহকে এমনই পরস্পরসম্বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক দ্বন্দ্ববিবাদ ও যুদ্ধকলহের তরঙ্গের আঘাত জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত খুবই সামান্য পরিমাণে হইলেও কিছুনা কিছু স্পর্শ করে। এই আঘাতবিস্তারের প্রতিরোধ করিবার জন্য আন্তর্জাতিক আপোষের আদর্শ যে ক্রমশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা বড়ই সুখী হইতেছি। এই রকম সালিসির ব্যবস্থা বড়ই সুন্দর। সালিসি দ্বারা আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা না থাকিলে অনেক স্থলে সামান্য কলহও বড়ই বৃহদাকার ধারণ করে। তাই আমরা দেখি যে, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি সকল ক্রীড়াদ্বন্দ্বে (match) বিবাদের উৎপত্তি হইলে মীমাংসার জন্য এক এক জন মধ্যস্থ রাখা হয়। একেবারেই এতটুকু ভুল করিবে না, এমন মধ্যস্থ পাওয়া অসম্ভব। তথাপি, ক্রীড়াক্ষেত্রে ঘুসাঘুসি দ্বারা বিবাদ মীমাংসা করিতে যাওয়া অপেক্ষা একজন মধ্যস্থের কথা মানিয়া লইয়া বিবাদ মীমাংসা করা অনেকাংশে ভাল। আমরা আশা করি, আজকালকার আন্তর্জাতিকতার ভণ্ডামির পরিবর্ত্তে বিভিন্ন জাতিগণ সত্য সত্য সালিসির সাহায্যে পরস্পরের সকল বিবাদ মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিবে এবং জগতের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইবে।

বর্ত্তমানে অনেক জাতি অনেক বিষয়ে পরস্পরকে সাহায্য করিতে উদ্যত দেখা যায়। একদেশের লোক গুরুতর অপরাধ করিয়া অন্যদেশে আশ্রয় লইলে তাহাকে মূল দেশের হস্তে সমর্পণ করিবার বিধি গৃহীত হইয়াছে। এই যে সুবৃহৎ ডাকের চিঠি বিলির ব্যবস্থা, ইহাতেও সভ্যজগতের সকল জাতিই মিলিত হইয়াছে। সকল জাতিই পরস্পরের সমস্ত চিঠিপত্রই বহন করিয়া নিরাপদে ও নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিতে স্বীকার করিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে কয়েক বৎসর অন্তর অন্তর ডাকবিভাগের এক সম্মিলন হয়; সেই সম্মিলনে বিভিন্ন জাতি নিজ নিজ প্রতিনিধি পাঠাইয়া ডাকবিভাগের উন্নতিসাধন এবং নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ নির্দ্দিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করে। ডাকবিভাগের সুন্দর মিলিত ব্যবস্থার একটা দৃষ্টান্ত দিই। দুই পয়সার ডাকটিকিটের সবুজ রং, এক আনার টিকিটের একটু লালচে রং, আবার দশ পয়সার টিকিটের নীল রং; ঐ রকম দামের যে দেশে যে ডাকটিকিট আছে, সেই

সেই দামের টিকিটের সেই সেই রং রাখা হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত জগতের ডাকবিভাগের চিঠি বাছাইকারেরা সহজেই টিকিটের মূল্য বোঝা বিষয়ে অসুবিধায় না পড়ে।

শুধু যে, যে সমস্ত জাতি আমাদের প্রতিবেশী, তাহাদেরই সম্বন্ধে ন্যায়বিচারে অগ্রসর হইব তাহা নহে। যাহারা আমাদের হইতে অনেক দূরবর্ত্তী, যথা ইংরাজ ফরাসি, মার্কিন প্রভৃতি, তাহাদেরও প্রতি ন্যায়বিচার-প্রদর্শনে আমাদের পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়। মার্কিন জাতিকে ধরা যাক। ইংরাজদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত হইলেও আমরা তাহাদের বংশধর মার্কিন জাতির যে সমস্ত বুঝিয়া লইয়াছি তাহা নহে। তাহাদেরও মধ্যে এমন অনেক আচারব্যবহার আছে, যাহা ভারতবাসীর নিকট আশ্চর্য্য ঠেকে। টেবিলে বসিয়া কাঁটাচামচে খাওয়া, খাইবার পূর্ব্বে হাত-মুখ না ধোয়া এবং আহারের পর কুলকুচি না করা এবং রাস্তায় থুতু না ফেলিয়া রুমালে ভরিয়া রাখা—এসকল শুধু মার্কিন কেন, পাশ্চাত্য জাতি-সমূহেরই সাধারণ অভ্যাস। এখন, এইগুলির জন্য যদি আমরা তাহাদিগকে উপহাস করিতে উদ্যত হই, তাহারাও আমাদিগকে অনেক বিষয়ে সহজেই উপহাস করিতে পারে—এদেশের নরনারীর পরিধেয় বস্ত্রবিরলতা, পেটে-পাড়া কেশ-বিন্যাশ ইত্যাদি। চীনবাসীগণ লেখে উপর হইতে নীচে। মার্কিনদের চক্ষে যদি ইহা উপহাসের বস্তু হয়, তবে মার্কিনেরা যে বামদিক হইতে ডাইনে লেখে, চীনবাসীরাও তাহা লইয়া উপহাস করিতে পারে। ন্যায়বিচারে দেখিতে গেলে, এবিষয় লইয়া কেহ কাহাকে উপহাস করিবার অধিকারী নয়। ইংলণ্ডের অধিবাসী যখন বিনা বস্ত্রে বৃক্ষে বৃক্ষে লাফাইয়া বেড়াইত, তখন চীনের অধিবাসীরা সভ্যতার অত্যুচ্চ সোপানে অধিরূঢ় ছিল। মার্কিনগণ যখন সভ্যতার স জানিত না, তখন ভারতের অধিবাসীগণ ব্রহ্মবিদ্যা অধিগত করিয়া বিজ্ঞানে প্রজ্ঞানে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভূখণ্ড যখন অজ্ঞানের অন্ধকূপে নিমগ্ন ছিল, প্রাচ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীগণ সেই সময়ে মুদ্রাযন্ত্র, দিগ্‌বীক্ষণ, কয়লা, ঢালাই লোহা, চীনামাটি, মুদ্রা, ব্যাঙ্কের নোট, চা, রেসম, ঘুড়ি প্রভৃতি অনেক বিষয়ের বিদ্যা অধিগত করিয়াছিল। প্রাচ্যদিগের কৃষিপ্রণালী অতি সুন্দর। কারুকার্য্যে তাহারা সুনিপুণ। প্রাচ্যবাসীরা সমস্ত দেশ ছাইয়া বিদ্যালয় খুলিয়া বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে জানিত। ভারতে ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়া ভারতবাসীকে জ্ঞানে প্রেমে ধর্ম্মে কর্ম্মে বিদ্যায় অর্থে সকল বিষয়ে উন্নতির সমুন্নত শিখরে উত্তোলিত করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ খৃষ্টের যে দশোপদেশ লইয়া বড়ই গৌরব করিয়া থাকেন, খৃষ্টজন্মের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঐ দশ উপদেশ এবং উহার অতিরিক্ত অনেক—অনেক সুন্দর নীতি ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেওয়া আছে।

বর্ত্তমানে সকল সভ্য জাতিই পরস্পরের বিষয়ে অনেক সত্য তত্ত্ব জানিয়াছে, সুতরাং কোন জাতি অপর জাতিকে ঘৃণা করিতে স্পর্দ্ধা করে না, বরঞ্চ পরস্পরকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতে শিখিয়াছে। সকল জাতিই পরস্পরের সদ্‌গুণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে শিখিয়াছে এবং পরস্পরের নিকট যে সকল বিষয়ে সহায়তা প্রাপ্ত হয়, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে বিস্মৃত হয় না। এমন কি, দুগ্ধপানের জন্য চীনা বাসনের ব্যবহার চীনের নিকট আমাদের ঋণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; আবার আমরা যখন স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হই এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যুক্ত হই, তখন মার্কিণের স্বাধীনতাসংগ্রামের নেতা জর্জ ওয়াসিংটন, এব্রাহাম লিংকল্‌ন্ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকটে আমাদের ঋণ প্রতিপদে স্মৃতিপথে উদিত হয়। একথা অবশ্য কেহই বলিবে না যে, অন্যান্য জাতির প্রতি ন্যায়বিচার করিতে হইবে বলিয়া নিজের দেশকে কিছুমাত্র কম ভাল বাসিতে হইবে। আমাদের প্রতিবেশীদের সদ্‌গুণসকল উপলব্ধি করি এবং সেই কারণে তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি বলিয়া এমন কোন কথা নাই যে, আমাদের নিজেদের পরিবারকে, নিজেদের আত্মীয়স্বজনকে কিছুমাত্র কম ভাল বাসিব।

—

মোহ।

(শ্রীহরিপদ দাস)

(প্রভু) নিজেরে বড় করিতে চাই
তোমারে করি' হেলা;
নিজের কাজে মত্ত হ'য়ে
কাটাই সারা বেলা।
জড়িয়ে আছি আমায় আমি,
ভুলেও তোমায় ভাবিনা স্বামী,
আত্মপরিজনে লয়ে
খেলছি মোহের খেলা।
প্রভু তোমারে করি' হেলা॥
তোমার দয়া ভুলে গিয়ে
আমার আমার করি,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে
অন্ধকারে ঘুরি।
পিছে এখন চেয়ে দেখি
আমি-আমার সবই ফাঁকি;
আমায় নিয়ে খেলছ তুমি
তোমার মায়ার খেলা।

—

রংপুরে রামমোহন রায়।

[সরকারী কাগজপত্র অবলম্বনে]

(শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

রামমোহন রায়ের সহিত রংপুরের সংস্রব এক সময় কিছু ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তিনি রংপুর কালেক্টরীর দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন,—কালেক্টর জন্ ডিগবী ছিলেন তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী।—এই সব কথার ভিত্তি বোধ হয়, ডিগবীর ১৮১৭ সালে লিখিত রামমোহনের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টি :—

"রামমোহন রায়—জাতিতে অতি সম্ভ্রান্তবংশীয় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, বয়স প্রায় ৪৩ বৎসর। তিনি প্রভূত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রের ভাষা সংস্কৃতে তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, তাহার উপর আবার তিনি ফার্সী ও আর্ব্বীও জানেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী হওয়াতে তিনি ধর্ম্ম ও জাতি-সম্পর্কিত অন্ধ সংস্কার সম্বন্ধে অল্প বয়স হইতেই অশ্রদ্ধা পোষণ করেন। বাইশ বছর বয়সে তিনি ইংরেজি শিখিতে সুরু করেন। কিন্তু প্রথমে তিনি এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। পাঁচ বৎসর পরে যখন আমি তাঁহার সহিত পরিচিত হই, তখনও তিনি কেবল নিতান্ত সাধারণ বিষয়ে কোনরূপে কাজ চালাইবার মত ইংরাজী বলিতে পারিতেন,—নির্ভুলভাবে এ ভাষা মোটেই লিখিতে পারিতেন না। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিবিল সার্ব্বিসে আমি যে জেলায় পাঁচ বৎসর ধরিয়া কালেক্টর ছিলাম, পরে তিনি সেই জেলার দেওয়ান, অর্থাৎ রাজস্ব আদায়-বিভাগের প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমার লিখিত সরকারী চিঠিপত্র যত্ন ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিয়া এবং ইউরোপীয় ভদ্রলোকগণের সহিত বার্ত্তালাপে এবং পত্রাদিব্যবহারে অবশেষে তাঁহার এমনি সঠিক ইংরেজী জ্ঞান জন্মিয়াছিল যে, তিনি যথেষ্ট নির্ভুলভাবে এই ভাষা লিখিতে ও বলিতে পারিতেন। ইহা ছাড়া ইংরেজী সংবাদপত্র পড়িবার খুব অভ্যাস তাঁহার ছিল। প্রধানতঃ ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি তাঁহাকে আকর্ষণ করিত। সংবাদপত্র-পাঠের ফলে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্তার বীরত্ব ও গুণ-সম্বন্ধে তিনি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। নেপোলিয়নের কার্য্যাবলীর মহিমা রামমোহনকে এতই চমক লাগাইয়াছিল যে, তদনুষ্ঠিত পাপের নিদারুণতার প্রতি না হউক, পাপাচরণ সম্বন্ধে রামমোহনের যথেষ্ট সংশয় ছিল এবং ইংরেজ জাতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও, নেপোলিয়নের রাজ্যচ্যুতিতে তিনি অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছিলেন। দুঃখের প্রথম বেগ মন্দীভূত হইলে, যে-সকল কার্য্যের ফলে নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাঁহার সেই-সকল রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ রামমোহনের কাছে এতই দুর্ব্বলতার পরিচায়ক ও এত অধিক দুরাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত বলিয়া মনে হইল যে, তিনি স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন, বোনাপার্টির উপর ঘৃণা তাঁহার পূর্ব্ব শ্রদ্ধার অনুরূপ হইবে।" *

রংপুরে রামমোহনের এই সরকারী চাকরি সম্বন্ধে তাঁহার চরিতকারেরা আরও লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যের অনুরোধে উচ্চপদস্থ দেশীয় লোককে পর্য্যন্ত সিবিলিয়ানদের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত,—তখনকার দিনে ইউরোপীয় সিবিলিয়ানরা এই নিয়ম জোর করিয়া চালাইতেন। কালেক্টরের উপস্থিতিতে রামমোহনকে কখনও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে না, এবং একজন সাধারণ দেশীয় আমলা বলিয়া তাঁহাকে আদেশ প্রদান করা হইবে না,—মিঃ ডিগবীর দস্তখতে তাঁহার সহিত রামমোহনের এইরূপ একটা চুক্তি ছিল।" †

এই জনশ্রুতি সত্য না হইতে পারে। কিন্তু ডিগবী যে রামমোহনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং উভয়ের মধ্যে যে অনাবিল বন্ধুত্ব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কর্ম্মগ্রহণকালে ইংরেজী ভাষায় রামমোহনের তেমন দখল ছিল না। ডিগবীর ন্যায় উদারহৃদয় মহাপ্রাণ রাজপুরুষের সাহচর্য্যই তাঁহার ইংরেজী ভাষার জ্ঞানবর্দ্ধনে সহায়তা করিয়াছিল।

কিন্তু রামমোহন সত্যই রংপুরে দেওয়ানের পদ পাইয়াছিলেন কি না, পাইয়া থাকিলে কবে বা কতদিন এই পদে নিযুক্ত ছিলেন, অথবা আর কোথাও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বা অপর কাহারও অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলেন কি না,—এ বিষয়ে রামমোহনের প্রচলিত কোন জীবন-চরিতই আলোকপাত করে না। সুখের বিষয়, বাংলা সরকারের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানের ফলে সম্প্রতি যে-সব চিঠিপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে রংপুরে রামমোহনের কর্ম্মজীবনের সঠিক বিবরণ পাওয়া যায়; শুধু তাহাই নহে, রংপুরে আসিবার পূর্ব্বে রামমোহন কি কার্য্য করিতেন, তাহারও ইঙ্গিত এই চিঠিগুলিতে বর্ত্তমান। ‡

* রামমোহন অনূদিত কেনোপনিষদ ও বেদান্তসারের একটি বিলাতী সংস্করণ ১৮১৭ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। বিলাতে অবস্থানকালে ডিগবী ইহা সম্পাদন করেন। ভূমিকায় তিনি অনুবাদক রামমোহনের এই পরিচয়টি দিয়াছেন।

† রামমোহনের মৃত্যুর পর, ১৮৩৩ ৫ই অক্টোবর তারিখের Court Journal-এ আর, মণ্টগোমারি মার্টিন-এর একখানি পত্রে সর্ব্বপ্রথম এই বিবরণটি প্রকাশিত হয়।

‡ স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের

রামমোহনকে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া, রংপুরের কালেক্টর ডিগবী সাহেব বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর সেক্রেটারীকে এই মর্ম্মে পত্র লেখেন :—

"আপনার গত মাসের ২৩শে [নভেম্বর] তারিখের পত্রের নির্দ্দেশ-মত, এই আপিসের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান গোলাম শা'র পদত্যাগের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছি এবং বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, সেই পদে আমি রামমোহন রায়কে নিযুক্ত করিয়াছি। রামমোহন অতি সম্ভ্রান্ত বংশজাত, বিশেষ সুশিক্ষিত এবং দেওয়ানের কার্য্য পরিচালন করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহাকে আমি বহুকাল ধরিয়া জানি, সেই হেতু আমি মনে করি, তিনি সাধুতা, যোগ্যতা ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য চালাইতে পারিবেন। আশা করি, বোর্ড তাঁহার নিয়োগ অনুমোদন করিবেন।" (১৮০৯, ৫ই ডিসেম্বর)*

১৮০৯, ১৪ই ডিসেম্বর, রংপুর কালেক্টরের পত্রের উত্তরে বোর্ড জানিতে চাহিলেন, কাহার অধীনে এবং কোন্ সরকারী কার্য্যে রামমোহন রায় কর্ম্ম করিয়াছেন, এবং তাঁহার জামিনদাতার নামই বা কি? †

রংপুরের কালেক্টর হইবার (১৮০৯ ২০শে অক্টোবর) পূর্ব্বে ডিগবী সাহেব সরকারী কর্ম্মে রামগড় যশোহর ও ভাগলপুরে অবস্থান করেন। ‡ রামমোহন তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন ও তাঁহার অধীনে কখন সরকারী, কখন বা বে-সরকারী কাজ করেন। রামগড়ে রামমোহনের কর্ম্মের কথা বোর্ডকে লিখিত ডিগবীর নিম্নলিখিত পত্রখানি হইতে জানা যায় :—

"আপনার এই মাসের ১২ই [১৪ই?] তারিখের পত্রের উত্তরে, বোর্ডের অবগতির জন্য আপনাকে সসম্মান নিবেদন করিতেছি যে, যখন আমি রামগড় জেলায় অস্থায়িভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছিলাম, তখন রামমোহন রায়—এই আপিসের দেওয়ান-পদের জন্য যাঁহাকে সুপারিশ করিয়াছি—আমার অধীনে তিন মাস যাবৎ ফৌজদারী আদালতের শেরিস্তাদারের কাজ করেন। ঐ সময়ের মধ্যে, এবং আমার যশোহরের কালেক্টররূপে কার্য্যকালে কোম্পানীর আইন-কানুন ও হিসাবপত্র সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের জ্ঞানের যে পরিচয় পাই, এবং তাঁহার সহিত পাঁচ বৎসরের পরিচয়ের ফলে তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সাধারণ গুণাগুণ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তিনি কালেক্টরের আপিসের দেওয়ান পদের বিশেষ উপযুক্ত।

"আপনাকে আরও জানাইতেছি যে, চাকোইয়া প্রভৃতির জমিদার—জয়রাম সেন (ইনি কোম্পানীকে বছরে ২০,৯৩৫৸৵১০ সিক্কা টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন) এবং কুলাঘাট প্রভৃতির জমিদার পরলোকগত মীর্জ্জা মহম্মদ তকীর বংশধর, মীর্জ্জা আব্বাস আলী (ইঁহার দেয় রাজস্বের পরিমাণ বছরে ৯১৭৸/৫ সিক্কা টাকা)—উভয়েই রামমোহনের জন্য পাঁচ হাজার টাকার জামিনদার হইতে প্রস্তুত। ইহার সহিত তাঁহাদের জামিনপত্রের একটি নকল পাঠাইলাম।" (৩০শে ডিসেম্বর, ১৮০৯)*

পত্রখানিতে প্রকাশ, ডিগবী যখন রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন তাঁহার অধীনে রামমোহন তিন মাসের জন্য ফৌজদারী আদালতে শেরিস্তাদারের কাজ করিয়াছিলেন। কোন্ সময় ডিগবী রামগড়ের ম্যাজিষ্ট্রেট হন, সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে তাহা নির্দ্ধারণ করা দুরূহ নহে। ১৮০৫, ৯ই মে হইতে ১৮০৭ সালের শেষাশেষি পর্য্যন্ত ডিগবী প্রধানতঃ রামগড় জেলা-কোর্টের রেজিষ্টার ছিলেন। ১৮০৬ আগষ্ট মাসে রামগড়ের জজ ও ম্যাজি-

---

সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন (১৩৩৫, ১৩ই শ্রাবণ; ১৯২৮, ২৯শে জুলাই), তাহার পরিশিষ্টে ইংরেজী ভাষায় লিখিত এই চিঠিগুলি স্থান পাইয়াছে; কিন্তু অনেকস্থলে তারিখ প্রভৃতির ভুল আছে। ইহার পর, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় দাসগুপ্ত রংপুর কালেক্টরী হইতে নকল লইয়া চিঠিগুলি প্রকাশ করিয়াছেন (Modern Review, Septr. 1928, pp 274-78), কিন্তু প্রধানতঃ পাঠের দোষে এত ভুল থাকিয়া গিয়াছে যে, চিঠিগুলির স্থলবিশেষে অর্থবিকৃতি ঘটিয়াছে, অনেকাংশ বাদও পড়িয়াছে। এ বিষয়ে আমার প্রতিবাদ দ্রষ্টব্য (Modern Review, Octr. 1928, p. 434)

বাংলা সরকারের বোর্ড-অফ-রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের দপ্তর হইতে আমি মূল চিঠিগুলির যে নকল লইয়াছি, তাহারই বঙ্গানুবাদ এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত হইল।

* Board of Revenue Consultation 14 December, 1809. No. 23. ডিগবী সাহেবের চিঠিতে তারিখটি ভ্রমক্রমে ৫ই ডিসেম্বরের স্থলে ৫ই নভেম্বর আছে।

† Board of Revenue Procdgs 14 Decr. 1809. p 137.

‡ জন্ ডিগবীর কর্ম্মজীবনের তালিকা Dodwell and Miles-রচিত Alphabetical List of the Bengal Civil Servants (1780-1838). pp. 140 41. গ্রন্থে মোটামুটি এইরূপ দেওয়া আছে :—Date of Rank as Writer: Digby, John, 29 Aug. 1799. Appointments, etc: 1804. Aug. 1—Asst. to the Register of the City Court of Dacca. 1805, May 9—Register of Ramghyr. 1808. Jan. 15—Register of Bhaugulpore. 1809. Oct. 20—Collector of Rungpore 1815—At Home. 1819, Nov. 13—Returned India. 1821—Actg. Collector of Burdwan. 1822, Feb. 1—Collector of Burdwan. (Died March 19. 1826, at the Cape of Good Hope).

* Judicial (Civil) Procdgs. 21 Augt, 1806, No, 19

ষ্টেট—মিলার সাহেব পীড়িত হইয়া পড়িলে, বোর্ড ২১শে আগষ্ট তারিখে রেজিষ্টার ডিগবীকে রামগড়ের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে কাজ করিবারও ক্ষমতা দেন। * পরবর্ত্তী অক্টোবর মাসে আর-থ্যাকারে (R. Thackeray) রামগড়ের জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে ডিগবী ১৮ই অক্টোবর তাঁহাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিয়া, পূর্ব্বপদে কাজ করিতে থাকেন। †

বি-ক্রিস্‌প তখন বোর্ড-অফ-রেভিনিউ-এর অস্থায়ী সভাপতি ও পুরাতন সদস্য। তিনি ডিগবীর প্রস্তাবে আপত্তি তুলিলেন এবং মন্তব্য করিলেন,—"শুনিয়াছি, ডিগবী যে-লোকের হইয়া সুপারিশ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বে ঢাকা জলালপুরের অস্থায়ী কালেক্টর মিঃ উডফোর্ডের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। রামগড়ে শেরিস্তাদাররূপে কার্য্যকালে রামমোহনের আচরণসম্বন্ধে প্রতিকূল মন্তব্যও আমার কানে আসিয়াছে। এ অবস্থায় রংপুরের দেওয়ান-পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাবে মত দিতে আমি অনিচ্ছুক। বাস্তবিকপক্ষে, আপত্তি হিসাবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কোন ফৌজদারী আদালত রাজস্ব-বিভাগীয় কার্য্যের পক্ষে জ্ঞানলাভের শিক্ষাস্থল নয়, এবং রামগড়ের আদালতে তাঁহার তিন মাস কাল শেরেস্তাদারের কার্য্য রাজস্ব-বিভাগের গুরু দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ান পদ-প্রাপ্তির যোগ্যতারূপে নিশ্চয়ই বিবেচিত হইতে পারে না।..."

সভাপতির মন্তব্যটি হইতে অনেক নূতন কথার সন্ধান মিলিতেছে। কেন কালেক্টর ডিগবীর উচ্চপ্রশংসা উপেক্ষা করিয়া বোর্ড রামমোহনকে দেওয়ানের পদ দিতে অসম্মত হন, তাহার উত্তর কোন লেখকই দিতে পারেন না। কিন্তু এখন ব্যাপারটা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে। টমাস উড্‌ফোর্ডের (Thomas Woodforde) অধীনে রামমোহনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারিরূপে চাকরির কথাও এতদিন কাহারও জানা ছিল না। টমাস উডফোর্ড ১৮০২, ৩১শে ডিসেম্বর হইতে ১৮০৩, ১৪ই মে—এই পাঁচমাস ঢাকা জলালপুরে অস্থায়ী কালেক্টরের কাজ করেন। ‡ বিলাতে অবস্থানকালে বোধ হয় এই উডফোর্ড-পরিবারেরই সহিত রামমোহনের পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। * ১৮০৪ আগষ্ট মাসে ডিগবী সাহেব ঢাকা সিটি কোর্টের সহকারী রেজিষ্টার নিযুক্ত হন। খুব সম্ভব ঢাকাতেই রামমোহনের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয়।

যাহা হোক, সভাপতির আপত্তিতে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ রামমোহনকে দেওয়ান পদের উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। ডিগবীকে লেখা হইল,—

"আমাকে বোর্ড-অফ-রেভিনিউ আপনার গত ৩০শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রের প্রাপ্তিস্বীকার করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইতে বলিতেছেন যে, দায়িত্বপূর্ণ দেওয়ানের পদে যিনিই নিযুক্ত হউন তাঁহার এমন লোক হওয়া চাই যিনি রাজস্ব-বিভাগের খুঁটিনাটি কাজ করিতে কিছুদিনের জন্যও অভ্যস্ত, এবং রাজস্ব-আদায়কার্য্যের আইন-কানুন ও সাধারণ পদ্ধতিতে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে,—বোর্ড ইহা নিতান্তই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন।

"এই হেতু, আপনার মনোনীত ব্যক্তির নিয়োগে সম্মতি দিতে বোর্ড অপারক। এক ফৌজদারী আদালতে অস্থায়িভাবে শেরিস্তাদারের কার্য্য-সম্পাদন রামমোহন রায়কে যে দেওয়ানীর মত গুরুতর কর্ত্তব্যের পদে কোন অংশে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে, এমন কথা কিছুতেই বিবেচনা করা যায় না, কারণ দেওয়ানের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

"এ অবস্থায় বোর্ড ইচ্ছা করেন, আপনি এমন কাহাকেও নির্ব্বাচন করুন, যাঁহার রাজস্ববিভাগের সাধারণ জ্ঞান, দায়িত্ব ও অন্যান্য গুণাগুণ দেখিয়া আশা করা যাইতে পারে যে তিনি নির্ভুলভাবে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন।

"অধিকন্তু, বোর্ডের মতে এই ব্যবস্থা সম্ভব হইলে করা উচিত, যে জেলায় দেওয়ান নিযুক্ত হইবেন সেই জেলায় যেন দেওয়ানের জামিনগণের জমিজেরাৎ না থাকে,—কারণ তাঁহারা হয়ত ঐ জেলার উপর অসঙ্গত প্রভাব পরিচালন করিতে পারেন।" (১৫ জানুয়ারী, ১৮১০) †

(ক্রমশঃ)

* Ibid, 30 Octr. 1806, No, 18.

† Board of Revenue Con. 15 Jany. 1810, No. 10.

‡ Board of Revenue Con. 20 May 1803, No. 3.

* Life and Letters of Raja Rammohun Roy, by S. D. Collet (2nd ed,). pp. 203, 211, 218.

† Board of Revenue Procdgs, 15 Jany. 1810, pp. 135-36.

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বসন্ত।

শাম্‌—একতালা।

কোয়েলা কুহরে রে চাঁদিনী যামিনী আজি
কিবা মহানন্দে নরনারী পিয়া হের
নাচিছে প্রেম রসে মাতিয়া কাননে কাননে রে।
দখিনা মলয় বায়ু বহি সাথে
আলস আবেশে আনে রে
কবির পরাণে ভাব চয়্‌ উথলয়্‌
উঠে শত বিকাশিয়া প্রীতি কুসুম হরষে রে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী

৩ [ক্ষপা] ॥ ১´ ২ ৩
{ । পা পমা গা মা II ধা -া না ধা । নর্সা নধা পা -া । } -া ক্ষা ধপপা -া I
কো য়ে• • লা কু • • • •• হ• রে • • ◦ ••• রে

১´ [মা] ২ ৩ ১´
I গা -া রা রা । সা -া সা সা । সা ন্‌সরা সা সা I সা সা মা মা ।
চাঁ • দি নী যা • মি নী আ জি•• কি বা ম হা ন ন্দে

২ ৩ ১´ ২
। মা মা মা মা । মা গা মা গা I মা পা পা ক্ষপা । ধা ধান পক্ষা পা ।
ন র না রী পি য়া হে র না চি ছে প্রে• • ম র• সে

৩ ১´ ২ ৩
। গা মা ধপপা -া I মা গা গমা রা । সা পা ক্ষপধনা র্সা । না ধপক্ষপা গা মা II
মা তি য়া◦ ◦ কা ন নে◦ কা ন নে রে••• ◦ "কো য়ে•• • লা"

১´ ২ ৩ ১´
I পা ধা পা র্সা । র্সা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সর্রা র্সা র্সা I র্সা না ধা না ।
দ খি না ম ল য় বা য়ু ব হি সা থে আ ল স আ

২ ৩ ১´ ২
। র্সা র্রা -া র্সনা । র্সা ধা পা -া I পপা ধনর্সা না ধা । পা ক্ষপা গাঃ মপঃ ।
বে শে • আ• নে • রে ◦ ক ◦••• বি র প •• রা ••

৩ ১´ ২ ৩ [নর্সা -া]
। গাঃ মঃ রা সা I সা সা মাঃ গঃ । পা ক্ষা পা না । ধা নধা র্সা -া I
◦ • ◦ ণে ভা ব চ য়্‌ উ থ ল • • •◦ • য়্‌

১´ [র্মা র্মা] ২ ৩ ১´
I র্সা র্সা র্গা র্গা। র্রা র্রা র্সা র্সনা। ধা ধনা র্সর্রা র্সা I না ধা র্সা না।
উ ঠে শ ত বি কা শি য়া॰ ॰প্রী॰ ॰॰ তি কু সু ম হ

২ ॰
। ধা পা হ্মপধনা র্সা। না ধপহ্মপা গা মা II
র যে রে॰॰॰ ॰ "কো য়ে॰ ॰ ॰ ॰ লা"

তান ১´ ২ ৩
I সমা গপা হ্মধা পর্সা। র্সধা পহ্মা পধনা র্সা। পা হ্মপা গা মা I
কোয়েলা ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰॰ ॰ কো য়ে॰ ॰ লা ইত্যাদি।

গান্ধারী—তেতালা।

১ম গান।

তব পদে লভি' চিত্তে
উঠে মুঞ্জরিয়া
গীতি শত নব রাগে।
তব হাসি ফুটুক করিয়া মম
মরম-বনে সুরভিত—
তব পদে এই ভিক্ষা জাগে॥

২য় গান।

তোমা হারাইয়া
প্রাণ গেছে শুকাইয়া—
গান যে নাহি উঠে জাগি।
নামে তব উঠুক বাজিয়া পুনঃ
মরম-বীণা দিন রাতি—
প্রভু হে তব দয়া মাগি॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

৩ ॰ [পা দা] ১ [মজ্ঞা -া রসরা] ২´
। মা পমা পা র্সা। গা দা পাঃ দঃ। মপা মজ্ঞা রঃ সরা I মা মা পা -া।
(১) ত ॰॰ ব প॰ দে ল ভি' ॰ ॰ চি ॰ ॰ ত্তে উ ঠে ॰
(২) তো॰॰ মা হা রা ই য়া ॰ প্রা ॰ ॰ ণ গে ছে ॰

৩ ॰ ১ ২´
। পণা দা দা পা। মমা -া পদপা মপা। মজ্ঞজ্ঞা -া জ্ঞরা জ্ঞসা I ণ্সা রমা পণা ণা।
(১) মু ॰ ঞ্জ রি ॰ ॰ ॰॰॰ ॰ য়া॰॰ ॰ ॰॰ ॰ গী॰ ॰॰ ॰॰ তি
(২) শু ॰ কা ই ॰ ॰ ॰॰॰ ॰ য়া॰॰ ॰ ॰॰ ॰ গা॰ ॰॰ ॰ন্ যে

৩ ॰ ১ ২´
। দা দা পা দপা। দপা দমা মা -া। পদা ণর্সা -া র্সা I র্জ্জর্জ্জা র্রর্সা ণদা পমা II
(১) ॰ শ ত ॰॰ ॰॰ ॰॰ ন ॰ ব॰ ॰॰ ॰ রা গে॰ ॰॰ ॰॰ ॰॰
(২) ॰ না হি ॰॰ ॰॰ ॰॰ উ ॰ ঠে॰ ॰॰ ॰ জা গি॰ ॰॰ ॰॰

৩ ॰ ১ ২´
। -া -া -া -া {। পা মা মদা ণদা। ণা র্সা র্সা র্সা I -া র্রর্রা ণর্সা র্সা।
(১) ॰ ॰ ॰ ॰ ত ব হা সি॰ ফু টু ক ॰ ॰॰ ॰॰ ক
(২) ॰ ॰ ॰ ॰ না মে ত ॰॰ ব উ ঠু ক ॰ ॰॰ ॰॰ বা

৩ ● ১ ২´
। র্সা র্সা র্সা র্সা। ণদা ণা র্সর্রজ্ঞা -া। র্রা -র্জ্ঞ´ র্সা -া I র্সা র্সা :- র্রর্রা।
(১) রি য়া ম ম ম য় ম • • • ষ • নে • সু র • • •
(২) জি য়া পু নঃ ম য় ম • • • বী • ণা • • দি ন • • •

৩ ● ১ ২´
। ণর্সা ণদা -া পা} । দা পা মজ্ঞা -া। রা গরা মা মা I পা -া -া -পা।
(১) • • ভি • ত ত ব প • • • • দে এ • ই ভি
(২) • • বা • তি প্র ভু ত • • • • ব হে • • দ

৩ ● ১
। ণদা ণা দা মা। া- মঃ দঃ ণঃ দঃ ণঃ র্সঃ। -া -া দণা র্সর্রা I
(১) ক্ষা • • • • জা • • • • • • • গে• • •।
(২) য়া • • • • মা • • • • • • • গি• • •

২´
। র্জ্ঞর্জ্ঞা র্রর্সা ণদা পমা IIII
(১) • • • • • • • •
(২) • • • • • • • •

প্রতিভার জন্মরহস্য।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ বি-এল, বিদ্যার্ণব)

সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ প্রোঃ লম্ব্রোজো (Lombroso) বলেন,

"A man of genius" this apparently highest product of the race is in reality not a culminant, but an abberant manifestation.

প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে আপাত-দৃষ্টিতে জাতীয় জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি উন্নতির স্বাভাবিক পথের শেষ সীমানায় সমুন্নীত পুরুষ নহেন, পক্ষান্তরে তিনি উৎক্রান্ত শাখান্তরের বিকাশ-মাত্র, সুতরাং "a man of genius must be classed with criminals and lunatics, as persons in whom a want of balance or compieteness of organization, has led to an over-development of one side of their nature; helpful or injurious to other men as accident may decide,"

"প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সামাজিক নিয়ম-লঙ্ঘনকারী অপরাধী ও বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির সঙ্গে একপর্য্যায়ভুক্ত; এই সকল লোকের প্রকৃতি, শারীরিক যন্ত্রগুলির মধ্যে সমতারক্ষার অভাব নিবন্ধন কোন বিশেষ দিকের ভাবগুলির অস্বাভাবিক স্ফুরণ হইয়াছে মাত্র। এই সকল ব্যাতিরেকী প্রকৃতি অপরের পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল হইবে তাহা অবস্থাবিশেষে নির্দ্ধারিত হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, একদল মনে করিতেছেন, এই বৈজ্ঞানিক যুগে এমন শুভদিন আসিবে যখন মানব মাত্রেরই জীবনে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হইবে এবং সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিবে। ব্যক্তি-বিশেষকে আর প্রতিভাশালী বলিয়া অভিহিত করিবার কারণ থাকিবে না।

আবার কাহারো মতে যে সকল উপাদানের উপর এই জটিল দেহযন্ত্রটি নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের সম্মিলিত উৎকর্ষের ভারবহনক্ষমতা শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে। সম্মুখে উন্নতির দিকে আর অগ্রসর না হইয়া বরং ধ্বংসের পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক দাঁড়াইয়াছে; এবং যে সকল বিচিত্র যন্ত্রের পরস্পরের

সাহায্য ও আনুগত্য হইতে এই দেহরূপ যন্ত্রটি চলিতেছে—তাহাদের মধ্যে সাম্যের অভাব, কোনটির যথাযথ ও কোনটির অবৈধ প্রাধান্য হইতে অবস্থাবিশেষে প্রতিভা, উন্মাদকতা ও সমাজের অনিষ্টকর অপরাধতৎপরতার উৎপাদক শক্তি সকল প্রকাশ পাইতেছে। লম্ব্রোজোর মতে প্রতিভা মানবপ্রকৃতির সমঞ্জসীভূত বিকাশের পরিচায়ক না হইয়া, বরং ইহার কোন অংশবিশেষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বুঝাইতেছে। প্রকৃতির অপর কোন দিকের বিকাশ অবরুদ্ধ হইয়া এই বিশেষ দিকটা খুলিয়াছে মাত্র, এই বিকাশটা অপরের পক্ষে হিতকর কি অনিষ্টকর হইবে তাহা আবেষ্টনপ্রসূত আকস্মিক ঘটনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়—From the sublime to the ridiculous is but one step.

উল্লিখিত মতগুলি সকলই বাহিরের দেহরূপ যন্ত্রটি লইয়া। ইহাই যদি মানবজীবনের একমাত্র দিক হইত, তবে লম্ব্রোজোর মতকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত, কিন্তু এত সহজে মানবশক্তির সীমানা নির্দ্দেশ হয় না।

F. W. Myers প্রতিভা (genius) সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

"Genius—if that vaguely used word is to receive anything like a psychological defination, should be regarded as a power of utilizing a wider range than other men can utilize, of faculties in some degree innate in all—a power of appropriating the results of subliminal mentation, to subserve the supraliminal stream of thought, so that an inspiration of genius, will be in truth a subliminal uprush ; an emergence into the current of ideas, which the man is consciously manipulating of other ideas, which he has not originated, but which have shaped themselves beyond his will—in profound regions of his being."

মনস্তত্ত্বের ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে প্রতিভা শব্দে এই বুঝায় যে, সকল মানবের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকিলেও যে শক্তি অপরাপর সাধারণের মধ্যে অপরিস্ফুট অবস্থায় রহিয়াছে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে তাহাকে বিশদরূপে নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা ; যে ক্ষমতা অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিজের অজ্ঞাতে সমুৎপন্ন চিন্তাকে ব্যবহারিক জীবনের চিন্তাস্রোতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে সমর্থ হয় ; সুতরাং প্রতিভার উচ্ছ্বাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শক্তি—যাহা মানবজীবনের অভ্যন্তরতম প্রদেশে তাহার নিজের ইচ্ছাশক্তির অনপেক্ষ ভাবে তাহার অপরিজ্ঞাতে যে সকল চিন্তার উদ্ভব হইতেছে তাহাদিগকে তাহার ব্যবহারিক জীবনের সংজ্ঞাভূমিতে সমুৎপন্ন চিন্তাগুলির সঙ্গে সমবেতভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিতে সমর্থ হয়।

এই প্রসঙ্গে মায়ার (Myers) গণিতশাস্ত্রে অনির্ব্বচনীয়রূপে সমুৎপন্ন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন কতকগুলি শিশুর উল্লেখ করিয়াছেন ; এস্থলে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয়—দেখা যায় যে, অতি শৈশবে এই শক্তির প্রকাশ পায়—কাহারও জীবনব্যাপী এই শক্তি বিদ্যমান থাকে, কাহারও কয়েক বৎসর পরে তাহা বিলুপ্ত হয়। উত্তরকালে যে সকলেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। বরং তালিকা হইতে দেখা যায়, তাহাদিগের মধ্যে উত্তর কালে কেহ প্রতিভাশালী, কেহ সাধারণ, কেহ বা নিতান্ত নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আম্পায়ার (Amper) চারি বৎসর বয়ঃক্রমের সময়, গস্ (Gauss) তিন বৎসর বয়ঃক্রমের সময় এই শক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; ১০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিডারের (Bedder) মধ্যে এই শক্তি প্রকাশ পায়। লগারিথম টেবল তৈয়ারে বিডারের এই শক্তি বিশেষ কার্য্যে লাগিয়াছিল।

বিডার স্বয়ং "Proceedings of the Institute of Civil Enginees" (Vol. XV) এ লিখিয়াছেন :—"যখনই আমার অন্তর্নিহিত এই শক্তি প্রয়োগের কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করি, তখনই যেন বিদ্যুৎবেগে তাহা আমার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে এরূপ দেখি।"

ঐ Proceedings এর Vol. C III Mr. W. Pole. F. R. S. বিডারের লগারিথেম রাশিগণনার ক্ষমতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বিডার মানববুদ্ধির অনধিগম্য অথচ এক সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে যত বড় বড় রাশির গুণফলই হউক না কেন, সেই গুণফলটি দেখিবামাত্র মূল রাশিগুলি বলিয়া দিতে পারেন। যেমন তাঁহাকে বলা হইল কোন্ কোন্ রাশির গুণফল ১৭,৮৬১ হইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিলেন, ইহা ৩৩৭ ও ৫৩ এই দুই রাশির গুণফল। কিরূপে তিনি ইহা বাহির করেন নিজেই তাহা বলিতে পারেন না।

ম্যাঙ্গিয়ামিল নামক আর একটি বালক সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, ১৮৩৭ খৃঃ তাহার যখন মাত্র ১০ বৎসর ৩ মাস বয়স, তখন প্যারি নগরের সে সময়ের প্রসিদ্ধ বিদ্বৎসমাজাগ্রগণ্য এরেগো (Arago) তাহাকে ৩৭,৯৬,৪১৬ রাশির ঘনমূল কত এই প্রশ্ন করেন ;

অর্দ্ধমিনিট কাল মধ্যে বালক উত্তর করিল ১৫৬। এই বালক সিসিলির এক মেষপালকের পুত্র, পাঠশালায় শিক্ষালাভের কখনও সুযোগ পায় নাই।

তাহাকে পুনর্ব্বার প্রশ্ন করা হইল, কোন রাশির ঘনফলের সঙ্গে তাহার পাঁচগুণ বর্গফল যোগ করিলে যে রাশি পাওয়া যাইবে, তাহা ঐ মূল রাশির ৪২ গুণ যোগে ৪০ সমান হইবে। এবারও অর্দ্ধ মিনিটেরও অনধিককাল মধ্যে বালক উত্তর করিল ঐ রাশি '৫' হইবে।

আর একটি প্রশ্ন করা হইয়াছিল:—

কোন রাশির পঞ্চম মালটিপল, তাহাকে ৪ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হয় তাহার সঙ্গে ১৬৭৭৯ যোগের সমান হইবে। বালক এই প্রশ্নেরও ঠিক উত্তর দিয়াছিল। এমন কি, ২৮২৪৭৫২৪৯ এই রাশির দশমমূল কত হইবে এই প্রশ্নের উত্তরেও ক্ষণকাল চিন্তার পর বলিয়া দিল রাশিটি ৭।

ম্যাঙ্গিয়ামিলের দশ বৎসর বয়সের সময় এই শক্তি প্রকাশ পাইয়া কয়েক বৎসর পর তাহা চলিয়া যায়। উত্তর জীবনে তাহার মধ্যে প্রতিভার কোনরূপ বিকাশ দেখা যায় নাই। সম্প্রতি বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রামনিবাসী শ্রীমান সোমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটি বালকের মধ্যে এরূপ শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। এই বালকও অচিন্তনীয় উপায়ে এরূপ অল্পকাল মধ্যে কঠিন প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান দ্বারা লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। য়ুরোপ ও এমেরিকার অনেক স্থানে তাহার এই শক্তির পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

এই শক্তি লাভ সম্বন্ধে Myer এরূপ মন্তব্য করিতেছেন,—

"In almost every point, indeed where comparison is possible, we shall find this computative gift resembling other manifestations of subliminal facalty, such as the power of seeing hallucinatory figures rather than the results of steady supraliminal effort such as the power of steady logical analysis.

In the first place, this faculty inspite of its obvious connection with general mathematical grasp and insight, is found almost at random among non-mathematical and even quite stuped persons as well as among mathematicians of mark.

In the second place, it shows itself mostly in early childhood and tends to disappear in later life—in this resembling visualising power in general and the power of seeing hallucinatory figures in particular, which powers are habitually stranger in childhood and youth than in later years.

Again it is noticeable that when the power disappears early in life it is apt to leave behind it no memory whatever of processes involved.

বিষয়টি তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই রাশিগণনাশক্তি বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ন্যায় অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োগমূলক নহে; এবং ভ্রান্তিসমুদ্ভূত দর্শনের ন্যায় ইহা মনস্তত্ত্বের অপরিজ্ঞাত গভীরতম প্রদেশে অবস্থিত শক্তিবিশেষের বহির্মুখীন প্রকাশ।

যদিও আপাতত-দৃষ্টিতে এই শক্তির সঙ্গে গণিতবিজ্ঞানে পারদর্শিতার সংস্রব রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তথাপি প্রথমতঃ দেখা যায় যে, এই শক্তি গণিতজ্ঞ অগণিতজ্ঞ—এমন কি, কোন কোন স্থানে নিতান্ত নির্ব্বোধ লোকের মধ্যেও প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়তঃ ইহা শৈশবেই অধিকাংশ স্থলে প্রকাশ পাইয়া পরিপক্ক বয়সে একেবারে বিলুপ্ত হয়। এস্থলে ভ্রান্তিসমুৎপন্ন রূপদর্শন শক্তির সঙ্গে এই হিসাবে ইহার মিল রহিয়াছে যে, উভয় ক্ষেত্রেই বাল্য ও যৌবনের প্রারম্ভে এই শক্তিপ্রকাশের পর মাত্র কয়েক বৎসর বিদ্যমান থাকিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহা বিলোপ প্রাপ্ত হয়, মনের উপর ইহার কিছুমাত্র চিহ্ন থাকে না; এমন কি, উত্তরকালে জীবনপট হইতে এই শক্তির স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া যায়।

I shall urge that there is here no departure from normality, no abnormality at least in the sense of degeneration, but rather a fulfilment of the true norm of man, with suggestions it may be, of something supernormal; of something which transcends existing normality, as an advanced stage of evolutionary process transcends an earlier stage.

লম্ব্রোজোর মতে প্রতিভা একটি abnormal বা অস্বাভাবিক কারণসম্ভূত শক্তি বা বিষয়বিশেষের বিকাশ, যেমন শরীরের কোন অংশে গুল্ম (tumour) হইলে ঐ অংশের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সেই বৃদ্ধি অপর কোন অঙ্গের ক্ষতির কারণ হয়। মায়ারের মত কিন্তু ইহার বিপরীত। তিনি ইহার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম

দেখিতে পান না; পক্ষান্তরে ইহাকে মানবজীবনের স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়াই তাঁহার মনে হয়। উভয় মতেই সত্য রহিয়াছে, কিন্তু আংশিক সত্য; কেবল matereal plane বা প্রাকৃত রাজ্যের ভিতর দিয়া দেখিলে লম্ব্রোজোর যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি হইবে। প্রাকৃত রাজ্য অপেক্ষা মনোরাজ্যের শক্তির উপর অধিক লক্ষ্য রাখিয়া মায়ার তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মানবজীবনের উপর কিন্তু এই উভয় রাজ্যেরই প্রভাব রহিয়াছে, কাজেই কোনটীকেই পরিত্যাগ করিলে চলিবে না।

বিষয়টীর আরও গভীরভাবে আলোচনা প্রয়োজন।

বুদ্ধের আবির্ভাব।

(শ্রীরমণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ)

আদিম মানব জগৎপ্রপঞ্চের বিভূতিমান দৃশ্যাবলী নির্ব্বাক-বিস্ময়ে দেখিতে লাগিল,—অনন্ত দিব্, বিশাল পৃথিবী, বহুরূপী মেঘমালা, দিবাকর সূর্য্য, মনোহর উষা, সুধাকর সোম—প্রত্যেকেই তাহাদের উপর আপন আপন রহস্যজাল বিস্তার করিল। সরলপ্রাণ মানব স্বপ্ন দেখিয়া চমকাইয়া উঠিতে লাগিল। স্বপ্নরাজ্য তাহারা অবিশ্বাস করিতে পারিল না। ইচ্ছা করিলেই তাহারা যাহা-তাহা করিতে পারে না, তাহাদের শক্তি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই বাধা পায়। দেখিয়া শুনিয়া ঠেকিয়া তাহারা অলৌকিক দৈবী শক্তিতে বিশ্বাস করিতে শিখিল। দিব্, পৃথিবী, গগনার্ণব, সূর্য্য, সোম, উষা, নিশা প্রভৃতি বিস্ময়কর প্রাকৃতিক দৃশ্যপুঞ্জে ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন জীবত্ব ও দেবত্ব আরোপিত হইল। একদল যজ্ঞাদি সাহায্যে ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের তুষ্টিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; অপর কেহ কেহ চিন্তারাজ্যে আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, বিভিন্ন দৃশ্যাবলীর পশ্চাতে একটিমাত্র অচিন্ত্য শক্তির ক্রিয়াই বিদ্যমান। বরুণভক্ত বলিলেন বরুণদেবই ঐ শক্তি, অগ্নিভক্তগণ বলিলেন অগ্নিদেবই সেই শক্তি, এইরূপে পূজারীগণ যাঁর যাঁর দেবতার দাবী অগ্রসর করিলেন।* কেহ কেহ আবার আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিলেন—না, 'মহদ্দেবানাম্ পুরুষত্বমেকম্', 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—সমস্ত দেবগণের নিয়ামক শক্তি একই, একেকেই ঋষিগণ বহুনামে অভিহিত করেন।

যজ্ঞের প্রচণ্ড দাপে এই সকল জ্ঞানোপদেশ চাপা পড়িয়া গেল। বৃত্রসংহারের নিমিত্ত সোমরস দিয়া ইন্দ্রকে যথাযোগ্য বলবান করিতে কেহ নয়মাস, কেহ দশমাস কেহবা পুরাপুরি বারমাস সোমযাগ অনুষ্ঠান করিতে থাকিলেন।* যজ্ঞের পর যজ্ঞ বিধিবদ্ধ হইয়া ক্রমে গৃহস্থের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল। অনেকেই অতি প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্য্যন্ত যজ্ঞাচারী যন্ত্রবৎ হইয়া থাকিতে আর পছন্দ করিল না। তাহারা চাহিল শান্তি। মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিয়া, অনুভূতিবিহীন করিয়া তুলিতে পারিলেই তো আর যথার্থ শান্তিলাভ হয় না। নঙ্গর সাহায্যে সমুদ্রজাহাজকে অল্পে অল্পে টানিয়া যেমন তীরবর্ত্তী করা হয়, যজ্ঞাচারী চাহিলেন ঠিক তেমনি ভাবে তাঁহাদের দেবতাকে যজ্ঞোথিত শৃঙ্খলসাহায্যে শৃঙ্খলিত করিয়া নিজেদের নিকটে আকর্ষণ করিবেন। যজ্ঞ নিয়মানুযায়ী অনুষ্ঠিত হইলে দেবতা তাঁহাদের অভীষ্টপূরণে বাধ্য ছিলেন। অতৃপ্ত চিন্তাশীল দল এই সমস্ত মতবাদের যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইল না—প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানে তাহারা অরণ্য আশ্রয় করিল।

যজ্ঞের জটিল জালে 'একমেবাদ্বিতীয়মের' সূত্র আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। অরণ্যাশ্রয়ী ঋষিগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিলেন। তাঁহারা একের পর অন্য আরণ্যক-উপনিষদলব্ধ জ্ঞান জনসমাজে লইয়া আসিতে লাগিলেন। যজ্ঞাচারীর 'অগ্নিম্ ঈড়ে পুরোহিতম্' ছাপিয়া উদাত্ত-গম্ভীর নাদ উঠিল—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।
শোনো বিশ্বজন,
শোনো অমৃতের পুত্র যত দেবগণ—
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে,
মহান পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়; তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি'
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাহি।†

দেখিতে দেখিতে সগৌরবে ঘোষিত হইয়া গেল—

---

* Max Muller's Henotheism.

* বৃত্র মেঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ইন্দ্র বজ্রের। আর্য্যগণ যখন চাষবাস অবলম্বন করিলেন তখন সময়োচিত বৃষ্টির প্রয়োজন হইল। বৃত্র মেঘরূপে বৃষ্টি ধরিয়া রাখেন বলিয়া তিনি অসুর হইলেন। ইন্দ্র বজ্র সাহায্যে তাহাকে বধ করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রের শক্তি অটুট রাখিতে কারো মতে নয়মাস, কারো মতে দশমাস, কারো মতে সারা বৎসর তাঁহাকে সোমরস দিতে হয়।

† রবীন্দ্রনাথ।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"। কিন্তু সকলেই কিছু অদ্বৈতবাদী হইয়া উঠিল না। "So long as mankind thinks, there will be sects." * "মনুষ্যসমাজ যতদিন চিন্তাশক্তির পরিচালনা করিবে, ততদিন বিভিন্ন মতাবলম্বীদলের সৃষ্টি হইবেই।" অরণ্যাশ্রয়ীদের মরণপণে সত্যান্বেষণের যে যুগ, সেই যুগে বিভিন্ন মতের জন্ম হওয়াই স্বাভাবিক। † হইয়াও ছিল তাহাই,—চার্ব্বাকের চূড়ান্ত নাস্তিকতা হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাস্বর আস্তিকতা পর্য্যন্ত এই একই যুগে জন্মলাভ করিয়া এই যুগকে প্রাণবন্ত ও গরিমাময় করিয়া রাখিয়াছে। এই যুগের অন্যূন দ্বিষষ্টিসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মত বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহাদিগকে মোটামুটি আট ভাগে বিভক্ত করা যায় :—

(১) যাঁহাদের মতে জগৎ ও জীবাত্মা সত্য ও নিত্য (শাশ্বতবাদী)।

(২) যাঁহাদের মতে শাশ্বতবস্তু এক (একচ্চ শাশ্বতিকা)।

(৩) অন্তানন্ত লইয়া যাঁহারা বিচার করেন (অন্তানন্তিকা)।

(৪) পাপপুণ্যই যাঁহাদের আলোচ্য বিষয় (অমরবিক্ষেপিকা)।

(৫) যাঁহাদের মতে সৃষ্টির কোন কারণ নাই (অধিচ্চ সমুপ্পন্নিকা)।

(৬) যাঁহারা জীবাত্মার ভাবী অস্তিত্বে বিশ্বাসী (উদ্ধম-আঘাতনিকা)।

(৭) যাঁহাদের মতে মৃত্যুর সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় (উচ্ছেদ-বাদা)।

(৮) যাঁহারা বলেন আত্মা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারে (দিট্ঠ-ধর্ম্ম-নির্ব্বাণ-বাদা)। ‡

ভিন্ন ভিন্ন মতবাদীদের বিচার-বিতর্কের ফলে ন্যায়শাস্ত্রের ভিত্তি পত্তন হইল। এই দার্শনিক যুগে নাস্তিক-আস্তিকেরই তুল্য মান। যাঁহারই একটা স্বাধীন মত ছিল, তিনিই আচার্য্য-পদবী দাবী করিতে পারিতেন। এই প্রাণবন্ত বিচারের যুগে স্থূলদৃষ্টিতে দুইটি দল দেখা যায়—যাহাদের একটা কিছু মত ছিল (dogmatic) এবং যাহারা শুদ্ধ সত্যান্বেষী (skeptic বা enquirer)। একদল লোক ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শিক্ষালাভ করিয়া সত্যান্বেষণে স্বাধীনভাবে পরিভ্রমণ ও জ্ঞানাচার্য্যদের সহিত বিচারবিতর্কে কালযাপন করিতেন। তাঁহাদিগকে পরিব্রাজক বলিত। অন্যান্য দল নিজ নিজ মতপ্রতিষ্ঠার জন্য বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন এবং পরাজিত হইলে বিজেতার ধর্ম্মগ্রহণ করিতেন।

সাধারণ লোকও নিশ্চেষ্ট ছিল না—সমগ্র দেশ জ্ঞানাচার্য্যদের আহ্বানে সাড়া দিল। একমাত্র কুরুপাঞ্চাল দেশেই যজ্ঞাচারীর ক্ষমতা আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিল। তবে জ্ঞানাচার্য্যদের প্রতাপ ক্রমে এমনি অদম্য হইয়া উঠিল যে, যজ্ঞবাদীরা তাঁহাদের মতের আস্তিকভাগ আরণ্যক ও উপনিষদ আকারে নিজেদের শাস্ত্রান্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

এই যুগ ভারতেতিহাসের এক মহাগৌরবময় যুগ। সমগ্র দেশব্যাপী এমন একটা প্রবল জ্ঞানস্পৃহা ভারত কেন সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসেও আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। * দার্শনিক বিচার-বিতর্ক লোককে যেন পাইয়া বসিয়াছিল। গ্রামবাসীরা মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে 'পরিব্রাজকারাম', 'কুতূহলশালা' নির্ম্মাণ করিয়া রাখিত। সেই সকল স্থানে বিভিন্ন মতাচার্য্যদের মধ্যে বিচার হইত। গ্রামবাসীরাও সেই বিচারে যোগদান করিত।

বিচারের ঘূর্ণাবর্ত্তে ধর্ম্মের ধার্ম্মিকতার মূল হারাইয়া গেল। কিন্তু সাধারণ মানব যুগ যুগ কেবলমাত্র দার্শনিক বিচার লইয়াই কিরূপে কাটাইবে!—প্রতিক্রিয়ার যুগ আসিল। বিচারে বিজেতার ধর্ম্মগ্রহণ তখনকার একটি নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রায় প্রত্যহই বিচার চলিয়াছে, কিন্তু প্রত্যহই নূতন নূতন মতগ্রহণ সাধারণ মানব পছন্দ করিবে কেন? শুষ্ক বিচারে শান্তি না পাইয়া তাহারা একটা সুবোধ্য এবং আচরণোপযোগী ধর্ম্মবাদের জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠিল।

---

* Swami Vivekananda.

† It is generally believed that the Upanishads teach a system of Pantheism; but a close examination will show that they teach not one, but various systems of doctrines, as regards the nature of God, man and the world, and the relations between them......The Upanisads......are compilations."

—Sir R. G. Bhanderkar; Vaisnavism, Saivism etc.

‡ ব্রহ্মজাল-সুত্ত Dialogues of the Buddha—Rhys Davids.

* In no other age and country do we find so universal diffused among all classes of the people, so earnest a spirit of enquiry, so impartial and deep a respect for all who rosed as teachers, however contradictory their doctrines might be?

American lectures—Rhys Davids.

এই সত্যান্বেষণের যুগে ক্ষত্রিয়গণের প্রধান প্রধান ভূমিকা গ্রহণ একটা রহস্য সৃষ্টি করিয়াছে। সংসারত্যাগী ক্ষত্রিয়দিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও কেকয়রাজ, বিদেহরাজ প্রভৃতির সিংহাসনারূঢ় থাকিয়াও আচার্য্যত্বের দাবী দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ অনুমান করিয়াছেন, মৃগয়াবিহারী রাজগণ অরণ্যাশ্রয়ী জ্ঞানাচার্য্যগণের সংস্পর্শে আসিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিতেন। হইতেও পারে। কিন্তু শ্রেণীহিসাবে তদানীন্তন ক্ষত্রিয়সমাজই উন্নততম ছিল, বুদ্ধ-বচন হইতে ইহাই অনুমিত হয়।

প্রতিক্রিয়ার যুগে আচরণোপযোগী ধর্ম্মদানের নেতৃরূপে আমরা দেখিতে পাই, তিনজন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়তিলককে—সাত্বত শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞাতৃক মহাবীর এবং শাক্য গৌতম। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী শ্রীকৃষ্ণের ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্যত্বস্বীকার স্বামী বিবেকানন্দের অনুমানের কারণের পক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। * মহাবীর ও গৌতমবুদ্ধও যে আরণ্যক ভাবরাশির সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

লোকমন যখন একটা সুবোধ্য ধর্ম্মাবলম্বনের জন্য উদ্‌গ্রীব, শ্রীকৃষ্ণ তখন কুরু-পাঞ্চালের পশ্চিমাংশে † ভক্তিপ্রধান ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিলেন। পূর্ব্বাংশে ‡ দাঁড়াইলেন মহাবীরস্বামী সুসংস্কৃত জৈনধর্ম্ম লইয়া। নিত্য নূতন মতবাদ শুনিয়া শুনিয়া তখনকার লোক সংশয়বাদী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া মহাবীর 'সপ্তভঙ্গী-ন্যায়' নামে একটি বিচারপ্রণালী গড়িয়া তুলিলেন। এই প্রণালী সাহায্যে তিনি সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে পূর্ব্বাচার্য্যগণের সকল মতবাদই সত্য—প্রতি মতেই আংশিক সত্যতা আছে। প্রতি বিষয়কে সাতটি দিক হইতে দেখা চলে। একদিক হইতে যাহা সত্য, অন্যদিক হইতে তাহাই মিথ্যা প্রতিভাত হইবে, আবার অপরদিক হইতে তাহাকে এককালে সত্য-মিথ্যা দুইই মনে হইবে; আবার সেটা যে সত্য নয়, অসত্যও নয় তাহাও প্রমাণ করা চলে। এইরূপে মহাবীর সকল মতের একটা 'যাহোক রকমের' সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, বিচারপ্রবণতার মুখে একটা বাঁধ দিবার প্রয়াস পাইলেন। স্বীয় মতাবলম্বীদিগের জন্য তিনি আচরণোপযোগী কিন্তু আচারবহুল একটি ধর্ম্মমার্গ নির্দ্দেশ করিলেন। তখনকার তাপসাদি যাবতীয় সম্প্রদায়কে মহাবীর ছাড়াইয়া উঠিলেন বটে, তবে জৈনের কঠোর আনুষ্ঠানিক জীবন অনেকেই খুব পছন্দ করিল না। বিচারবহুলতার ফলে সেই সময়কার সকলেরই স্ব স্ব এক একটা মত গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহাবীরের বিচারপ্রণালী অধিকাংশকেই শান্ত করিতে পারিল না। এই সত্যানুসন্ধিৎসা, এই তর্কবহুলতা, এই তপ্ত-অতৃপ্তির যুগে এমন একজন দেব-মানবের প্রয়োজন হইল, যাঁহার হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমভাবে বিকশিত; যিনি সর্ব্বসাধারণের মন ও প্রাণ উভয়কেই সান্ত্বনা দিতে সমর্থ; যাঁহার জ্ঞান সকলকে সত্যপথ দর্শাইবে, আর প্রেম যাঁহার সমস্ত অতৃপ্তি, সকল দীর্ঘশ্বাসকে অতল-তলে ডুবাইয়া দিয়া দুঃখময় এই মরজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবে।

হিমালয়মূলীয় শাক্যরাজ্য। রাজধানী তাহার কপিলবস্তু। ভাবে ভাষায় শাক্যগণ কোশলবাসীগণের সমজাতীয় হইলেও, শাক্যরাজ্য কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। * তেজস্বিতাবলে শাক্যগণ বিশাল কোশলরাজ্যের তটবর্ত্তী হইয়াও বহুকাল আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গণতান্ত্রিক শাক্যরাজ্যের প্রধান নায়ক যখন রাজা শুদ্ধোদন, তখন তাঁহার প্রধানা মহিষী মহামায়া দেবী ঘুমঘোরে এক স্বপ্ন দেখিলেন যে, দিক্‌পালগণ তাঁহার পালঙ্কখানি আকাশপথে বহিয়া হিমালয়ক্রোড়ে লইয়া গেলেন। পালঙ্ক রাখিয়া তাঁহারা সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর দেবকন্যাগণ আসিয়া সযত্নে তাঁহাকে 'অনোতত্ত' হ্রদের জলে স্নান করাইয়া দিব্য বসন-ভূষণ পরাইয়া দিলেন। দেবগণ আবার তাঁহাকে বহিয়া রৌপ্যচূড়ার উপরে একটি স্বর্ণমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে জ্যোৎস্নাস্নাত মেঘখণ্ডের মত † একটি শ্বেতপদ্ম হস্তে বোধিসত্ত্ব ধীরে ধীরে শূন্যপথে আসিয়া তাঁহার সমীপস্থ হইলেন। পালঙ্কখানি তিনবার পরিক্রম করিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণপার্শ্ব স্পর্শ করিলেন। পরমুহূর্ত্তে মায়াদেবী দেখিলেন বোধিসত্ত্ব শিশুরূপে তাঁহারই অন্তরশায়ী। মায়াদেবীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

আনন্দ ও উদ্বেগে মহামায়ার অবশিষ্ট নিশাভাগ কাটিল। পরদিন প্রত্যূষেই তিনি স্বপ্নব্যাপার মহারাজের কর্ণগোচর করিলেন। মহারাজা শুধু উদ্বেগের ভাগই পাইলেন। একটা অজানিত আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া তিনি অবিলম্বে রাজ্যের প্রসিদ্ধ বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ-গণকগণকে আহ্বান করিলেন। গণনার ফলে জানা গেল, মহিষীর গর্ভসঞ্চার হইয়াছে এবং ভাবী শিশু এই যুগের হয় শ্রেষ্ঠ রাজচক্রবর্ত্তী, নয়তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবেত্তা বুদ্ধ

* ছান্দোগ্য উপনিষদ মতে দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করেন।

† মথুরা অঞ্চলে।

‡ বিহার, মগধ, কোশল অঞ্চলে।

* পসেনদি—(বুদ্ধের প্রতি) অহমপি কোসলকো, ভগবাপি কোসলকো।

† অপর মতে শ্বেতহস্তীরূপে।

হইবেন। আশা-আশঙ্কা লইয়া রাজা-রাণী দিন গুণিতে লাগিলেন।

এই সময় একদিন মায়াদেবীর পিতৃগৃহ 'কোলিয়'-রাজ্যে যাইবার প্রবল বাসনা হইল। অন্তঃসত্ত্বার ইচ্ছা সর্ব্বদা পূরণ করিতে হয়। তাই রাজা সমারোহ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পিতৃরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। শাক্য ও কোলিয়-রাজ্যের সীমানায় লুম্বিনী গ্রাম। তথাকার প্রসিদ্ধ শাল-বন তখন নব পত্রপুষ্পে শোভিত। মায়াদেবীর তথায় আনন্দবিহারে বাসনা হইল। সহচরীগণ সহ তিনি উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। ক্রীড়াপরায়ণা রাণী একটি শালশাখা আকর্ষণ করিতে হস্তপ্রসারণ করিলেন, শাখাটি স্বেচ্ছায় অবনত হইল। শাখা আকর্ষণ করিতেই ভাবী-বুদ্ধ জন্মলাভ করিলেন—মহাব্রহ্মা দিক্‌পালগণ সহ নিমেষে আসিয়া স্বর্ণ উত্তরীয়ে তাঁহাকে ধারণ করিলেন। "আনন্দ কর মায়াদেবী, কারণ তোমার এই শিশু জগতের আশ্রয়-স্থল হইবে।"—বলিয়াই ব্রহ্মা প্রস্থান করিলেন। শিশুর প্রহরীরূপে দেবগণ অলক্ষিতে তাঁহাকে বেড়িয়া রহিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই বোধিসত্ত্ব উত্তরাভিমুখে সপ্তপদ অগ্রসর হইয়া সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলিলেন—"আমিই জগতে শ্রেষ্ঠ জীব, আমার আর জন্ম নাই।"

বৈশাখী পূর্ণিমাদিনে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করিলেন। ঠিক ঐ দিনেই জন্মলাভ করিলেন তাঁহার ভাবী পত্নী যশোধরা, ভাবী অনুচর আনন্দ, ভাবী সারথি ও বাহন ছন্দক ও কন্থক *। যে বৃক্ষতলে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই বোধিবৃক্ষও জন্ম লইল ঠিক এই দিনেই। †

ত্রিলোকদর্শী ঋষি অসিতদেবল হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করিলেন, দেবলোকে অস্বাভাবিক আনন্দ-কোলাহল—নৃত্যগীতের অবিশ্রাম উন্মাদনা। কারণ অন্বেষণ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন ভাবী বুদ্ধ শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অবিলম্বে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তিনি নবজাত শিশুর দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। শিশুসহ মায়াদেবী তৎক্ষণে প্রাসাদে আনীত হইয়াছেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গ সবিস্ময়ে দেখিলেন, মহর্ষি দেবল শিশুদর্শনে আপনার উচ্চাসন পরিত্যাগ করিয়া তাহার পদপ্রান্তে প্রণত হইলেন। রাজা শুদ্ধোদনও কোন্ এক অজানিত শক্তির তাড়নে মহর্ষির অনুসরণ করিয়া আপন পুত্রকে প্রণাম করিলেন। অসিত-মুনি অতঃপর এই দেবশিশুর বুদ্ধলক্ষণাবলী পরীক্ষা করিয়া আপনার ভবিষ্যদ্‌জ্ঞান নির্ভুল বুঝিয়া পরম হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সকলে ব্যস্ত হইলেন। মহর্ষি কিছুক্ষণ মৌনভাবে রহিয়া হঠাৎ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সন্তানের ভাবী অমঙ্গল দৃষ্টে ঋষি এইরূপ করিতেছেন ভাবিয়া রাজা শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। দেবল তখন বুঝাইয়া বলিলেন—'এই শিশু কালে বুদ্ধত্ব লাভ করিবে। কিন্তু আমার বুদ্ধদর্শন ঘটিবে না বলিয়াই রোদন করিতেছি—আয়ুঃশেষ হওয়ায় তৎপূর্ব্বেই আমার দেহত্যাগ ঘটিবে।' ঋষি ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সহায়ে দেখিলেন আপন ভ্রাতুষ্পুত্র নালক সময়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবে। তিনি তাহাকে এই শুভ সংবাদ দিতে ছুটিয়া চলিলেন। সংবাদ শুনিয়া নালক বুদ্ধের শিষ্য হইবার উপযুক্ততা লাভ করিবার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া তপাচারী হইলেন।

ষষ্ঠদিনে যথারীতি রাজপুত্রের নামকরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। শুদ্ধোদন আটজন বিশুদ্ধাচারী শাস্ত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। পানাহারে তুষ্ট করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে শিশুর ভবিষ্যৎগণনায় আহ্বান করিলেন। গণনার ফল পূর্ব্ববৎই হইল—সংসারী হইলে শিশু রাজচক্রবর্ত্তী এবং ত্যাগী হইলে জগদ্বরেণ্য বুদ্ধ হইবে। আঙ্গিক লক্ষণসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া কনিষ্ঠতম কিন্তু শ্রেষ্ঠ মেধাবান ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য বুদ্ধত্বের অনুকূলেই আপন নিঃসংশয় মত ব্যক্ত করিলেন। ইহা হইতে জগতের অশেষ ইষ্ট সাধিত হইবে বলিয়া শিশুর "সিদ্ধার্থ" নাম রাখাই স্থির হইল। * কৌণ্ডিন্য অনুধাবন করিয়া দেখিলেন তখন হইতে ৩৫ বৎসর পরে শুদ্ধোদনকুমার বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। তিনি বাপ্প, ভদ্রিক, মহানাম ও অশ্বজিৎ নামে চারিজন সুহৃৎ সহ সংসার ত্যাগ করিয়া বুদ্ধ-মিলনের মহাশুভক্ষণের অপেক্ষায় অরণ্যপ্রান্তে তপাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিন্তু যে মহীয়সী নারীর গর্ভ আশ্রয়ে বুদ্ধ ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন, নিজ পুত্রের অলোকসামান্য প্রতিভা ও গরিমা দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। নিয়তির কঠিন বিধানে সন্তান জন্মগ্রহণ করার সপ্তম দিবসেই দেবী মহামায়ার জীবনান্ত ঘটিল। শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া মহিষী, মহামায়ারই সহোদরা মহাপ্রজাপতি গৌতমী শিশুকে

* কন্থক—কণ্ঠক।

† এই দিনেই নাকি কালুদায়ী (যিনি বুদ্ধকে শাক্যরাজ্যে ফিরাইয়া আনিতে শুদ্ধোদন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন) এবং শাক্যরাজ্যে চারিটি রত্নখনিও জন্মলাভ করিয়াছিল। মহাযান মতে বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, প্রদ্যোত ও উদয়নও এই দিনেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। Rockhill's Life of Buddha.

* অপর মতে—পুত্রলাভে রাজার অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখা স্থির হয়। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত "বুদ্ধদেব" ৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন। অপরপক্ষে Spence Hardy প্রণীত Manual of Buddhism ১৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। গোতমীর স্নেহ-পালিত 'গৌতম' দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

বিবাহে পণপ্রথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বাঙ্গালী হিন্দু যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। যে সকল কুপ্রথা হিন্দু-সমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে তন্মধ্যে স্থান-বিশেষে শ্রেণীবিশেষে কন্যার বা পুত্রের বিবাহে অপর পক্ষের নিকটে পণগ্রহণপ্রথা যে অন্যতর প্রধান সহায় তাহা অবিসম্বাদিত। চক্ষের সম্মুখে বৎসরে বৎসরে পিতামাতা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে বসিবেন বলিয়া কত স্নেহের পুতলী স্নেহলতা আত্মবলিদান করিতেছে—তথাপি আমাদের প্রাণে সাড়া নাই, চেতনা আসে না। শুধু ভাবের স্রোতে ভাসিয়া আহা উহু করিলে চলিবে না; শুধু কবিতার পর কবিতায় দুঃখ প্রকাশ করিলে কোনই ফল হইবে না। বোধ হয় এমন একটী মাসিক পত্র বা সংবাদপত্র ছিল না, যাহাতে স্নেহলতার উপর গদ্যে বা পদ্যে কিছু না কিছু লেখা হয় নাই। কিন্তু তাহার পর?—

আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি যে, এমন কি অনেক উচ্চ শিক্ষিত, এমন কি কেন?, বিশেষভাবে, বিলাতফেরত অনেকের মধ্যে ছেলের বিবাহে পণ গ্রহণ একটা স্থায়ী প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কোনও কারণে বাপের হয়তো টাকার দরকার হইয়াছে, তিনি ওৎ পাতিয়া আছেন, কখন্ তাঁহার বিলাতফেরত ছেলের জন্য একটী ধনীর মেয়ের বিবাহের প্রস্তাব আসে, তাহা হইলে তিনি সুখে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া নিজের সুখসাধনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এইরূপ এক একটা দৃষ্টান্তের ফলে দেশ যে ধ্বংসের পথে অনিষ্টের পথে কতদূর অগ্রসর হয়, তাহা কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছেন? পিতার দৃষ্টান্তে বল পাইয়া পুত্র আবার নিজের পুত্রের বিবাহেও ঐ প্রকার পণপ্রথা বহাল রাখিতে দ্বিধা করেন না। দারিদ্র্যের দোহাই দিয়া এবং পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতিতে বিস্তর ব্যয় হইবার দোহাই দিয়া অনেক পুত্রের পিতা পণপ্রথার সমর্থন করেন। কিন্তু ইহার ভিত্তি যে কত দুর্ব্বল তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না। ইহার পরিণামে কত কন্যার পিতাকে ভিটাচ্যুত হইতে হয়, কত লোকের সম্পত্তি যে কাবুলী প্রভৃতি বিদেশীদের হস্তগত হয়, তাহার কে ইয়ত্তা করিয়াছে? সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাবে দুঃখদারিদ্র্যের পীড়নে যে সবল সন্তানাদির অভাব হয়, তাহা তো জানা কথা। সবল সন্তানের অভাব হইলে দেশের কল্যাণের জন্য হাহুতাশ ও চীৎকার করিয়া সারা হইলেও সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবে কে? এই ক্ষেত্রে তরুণ যুবকদিগের সংগ্রামে নামিয়া এই ভীষণ প্রথা উচ্ছিন্ন করিয়া দেশকে রক্ষা করিতে হইবে।

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণপ্রভৃতির মধ্যে যেমন কন্যার পিতামাতারা পণপ্রথার অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতেছেন, নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদির মধ্যে পুত্রের পিতারা এবং পুত্রগণ স্বয়ং পণপ্রথার কারণে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, অধিকারী ব্রাহ্মণ ও নিম্নশ্রেণীর শূদ্রদের মধ্যে কন্যাক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ না হইলে তো আমাদের ভাত রাঁধা চলে না। কিন্তু কয়জন চিন্তা করিয়াছেন যে এই কন্যাক্রয় প্রথার কারণে শতকরা শতজন হয় দেশ হইতে বিধবা আত্মীয়া বা নিজের পল্লীবাসী কোন বিধবা বা কুমারী বা বিবাহিতা পরপত্নীকে ভুলাইয়া আনিয়া স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করে, অথবা কলিকাতার কোন বেশ্যার সঙ্গে কিছুকাল স্বামীস্ত্রীরূপে থাকে অথবা সুবিধামত বিভিন্ন বেশ্যাকে লইয়া থাকে। ইহার ফলে তাহারা যক্ষ্মা কুষ্ঠ প্রভৃতি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে।

এই সকল সামাজিক কুপ্রথা, যেগুলি জাতিকে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিতেছে, দূর না করিলে সহস্র চীৎকারেও স্বাধীনতালাভের সম্ভাবনা নাই। রাজনৈতিক স্বাধীনতা-লাভ এবং সামাজিক কুপ্রথা দূর করা, এই উভয় কার্য্যেই সমান শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। একটী বাহিরের কথা, দ্বিতীয়টী অন্তরের কথা। বলা বড় কঠিন যে কোন্‌টাতে অগ্রে হস্তক্ষেপ করিব এবং কোন্‌টীতে বেশী শক্তি প্রয়োগ করিব। অগ্রে অন্তর পরিশুদ্ধ করিব অথবা অগ্রে দেহশুদ্ধি করিব—এই প্রশ্নের অনুরূপ ঐ প্রশ্নটী। প্রয়োজনমত দেহশুদ্ধির জন্য কালবিশেষে বা স্থলবিশেষে স্নানাদি করা আবশ্যক, কিন্তু অন্তরকে পরি-মার্জ্জিত করিবার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকা আবশ্যক। সেইরূপ সময়বিশেষে অবস্থাবিশেষে রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে গেলে সমাজসংস্কারের প্রতি সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

হিন্দুসমাজে এই অন্যায় প্রথা যে কখন্ এবং কি কারণে বা কি ভাবে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা সম্ভব নহে। তবে মনে হয়, অর্থসমস্যা ও শ্রেণীবিশেষে নরনারীর সংখ্যার অসামঞ্জস্য এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। হিন্দুর শাস্ত্রে বা সদাচার-সমূহের মধ্যে এই কুপ্রথার কোন স্থান নাই। হিন্দুর বিবাহে "সবস্ত্রাং সালঙ্কারাং" কন্যাদানের কথা আছে।

কিন্তু তাহারই ভাষ্য ও টীকাটিপ্পনীর জ্বালায় উহার অর্থ পণপ্রথায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে কন্যাক্রয়ের তীব্র নিন্দাবাদ সত্ত্বেও যখন উহা প্রচলিত হইয়াছে দেখা যায়, তখন আমার উপরোক্ত অনুমান নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। মিতাক্ষরা ও দায়ভাগে কন্যাকে "যৌতুক" দানের কথা আছে। কিন্তু তাহাতে পুত্রের বা পুত্রের পিতার কোন অধিকার থাকে না, তাহা কন্যার স্ত্রীধনে দাঁড়ায়—তাহাতে কন্যার বিনা অনুমতিতে কেহই হস্তক্ষেপ করিবার অধিকারী নয়।

বর্ত্তমানে, সামান্য অবস্থার লোকেরাও ছেলের বিবাহে অতিরিক্ত পণ দাবী করে। ছেলের অদৃষ্টে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকিট একটা জুটিয়া যায়, তাহা হইলে ছেলের বাপের কপোতের ন্যায় গর্ব্বস্ফীত বক্ষ—তাহা দেখিতেই আমোদ লাগে। পিতা হয়তো নানাবিধ অন্যায় খরচপত্র করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন; তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া পণের টাকার সাহায্যে সেই ঋণের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে চান। আমি দুইএক স্থলে দেখিয়াছি যে, এই প্রকার পণের টাকা নীলামের ডাকের মত চড়িতে চড়িতে এমন উচ্চে গিয়া দাঁড়াইল, যেখানে কোনও কন্যার পিতা আর নাগাল পাইল না। ছেলের বিবাহ না হওয়ায় ছেলে বয়াটে হইয়া গেল, তথাপি পিতা ধনুর্ভঙ্গ পণ ত্যাগ করিলেন না!

আমাদের মনে হয়, স্ত্রীশিক্ষার অভাব এই পণপ্রথা বজায় রাখিবার অন্যতর কারণ। ইহাও আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, যে সকল পরিবারে স্ত্রীশিক্ষা সুচারুরূপে প্রবেশ করে নাই, সেই সকল পরিবারেই "বধূকণ্টকী" খাশুড়ীর কিছু বেশী প্রাদুর্ভাব। স্ত্রীশিক্ষার অর্থে আমরা পাশ্চাত্য আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয়প্রবর্ত্তিত স্ত্রীশিক্ষা ধরিতেছি না—আমরা নারীচরিত্র গঠনের উপযোগী প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষাই ধরিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে উপযুক্ত পণ বা কন্যার অভিভাবকগণের নিকট হইতে উপযুক্ত উপঢৌকনাদি না পাইলে অনেক খাশুড়ী যেমন "বধূকণ্টকী" হইয়া বধূর উপর অযথা ও অকথ্য অত্যাচার ও যন্ত্রণা প্রদানে অগ্রসর হন, সেইরূপ অনেক গৃহে বধূও সুবিধা বুঝিয়া খাশুড়ীর উপর প্রতিশোধ তুলিতে পশ্চাৎপদ হন না।

আমাদের বুঝিতে হইবে যে, সমাজে পুরুষ ও স্ত্রী উভয়েরই সমান প্রয়োজন আছে। ভগবানের মঙ্গল বিধান অনুসরণ করিয়া সংসারকে উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে চাহিলে, পরিশুদ্ধভাবে জীবপ্রবাহ রক্ষা করিতে চাহিলে, পুরুষ ও স্ত্রী, নর ও নারী উভয়েরই সমান প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়কেই যে একই ছাঁচে গড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; উভয়কেই যে একেবারে একই শিক্ষা দিতে হইবে, এমনও কোন কথা নাই। উভয়কেই শিক্ষা দিতে হইবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ স্বভাবের ও নিজ নিজ কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া। সর্ব্বোপরি, আমাদের বক্তব্য এই যে, স্ত্রী হোক বা পুরুষ হোক, সকলেরই শিক্ষা ধর্ম্মের ভিত্তির উপর গড়িয়া তুলিতে হইবে। তবেই আমরা আশা করিতে পারি যে, ভারতের পূর্ব্বগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের নরনারী প্রত্যেকে নিজের নিজের উপযোগীরূপে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তখনই আমরা দেখিব যে, সমাজের দেহ হইতে অন্যায় অসঙ্গত দুর্নীতিমূলক কুপ্রথা ও কদাচারসকল জীর্ণ পত্রের ন্যায় স্বতই খসিয়া যাইবে।

ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপিত্ব।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী একথা মানিলে তাঁহার আবির্ভাবে সকল স্থানই পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। "সে কি কথা? যে সকল স্থানে চুরী ডাকাতী প্রবঞ্চনা ব্যভিচার ও নরহত্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে সকল স্থানও কি পবিত্র? ইহাও কি কখন সম্ভব?" হাঁ, নিশ্চয়ই সে সকল স্থানও পবিত্র,—একথা একবার নয়, কিন্তু সহস্রবার সত্য। যাহারা এই সকল পাপ আচরণ করে তাহারা অবশ্য ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না বা দেখিতে চায় না, কিন্তু নীরব সাক্ষীরূপে তিনি সে সকল স্থানেই উপস্থিত থাকেন। অনেক পাপী এই প্রকার দুষ্কর্ম্মের স্থানেই ঈশ্বরকে ধর্ম্মরাজ, বিচারপতিরূপে দর্শন করিয়া পাপের পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে।

বিশ্বাসী সাধুভক্তদিগের চক্ষে তিনি নরকের মত অপবিত্র স্থানেও বর্ত্তমান। সেন্ট পল্‌কে যখন রোমের কারাগারে বন্দী করা হইয়াছিল তিনি সেই অন্ধকার কারাগৃহকে ঈশ্বরের আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল দেখিতেন। প্রথম যুগের খৃষ্টীয়ানদিগকে যখন রোমকগণ সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক দেখিত, তখন প্রভু পরমেশ্বরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া সেই বিপুল জনসংঘের রাক্ষসবৎ নিষ্ঠুরতা আর তাঁহারা দেখিতে পাইতেন না। যখন সুন্দরী নির্ম্মলহৃদয়া খৃষ্টিয়ান রমণীগণকে পাশবিক অত্যাচারের জন্য বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যাইত তখন সেই পাপের দুর্গেই দেবকণ্ঠের স্বর্গীয় সঙ্গীত তাঁহাদের কর্ণে ধ্বনিত হইত। যাঁহার মন পবিত্র তাঁহার চক্ষে জগৎ পবিত্র। ভক্তের দৃষ্টিতে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল।

সকল স্থানই যে পবিত্র শুধু তাহাই নহে, কিন্তু সকল স্থানই সমান পবিত্র। আমাদের মনে হয় বটে যে কোন কোন স্থান অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অধিক পবিত্র, কিন্তু বাস্তবিক তাহা ভ্রম। সেই শৈশবের গৃহ যেখানে ভক্তির অশ্রুসিক্ত জননীর মুখে স্বর্গের জ্যোৎস্না দেখিয়াছিলাম, সেই প্রশান্ত নদীবক্ষঃ যেখানে একদিন চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত সন্ধ্যায় ভগবানের বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলাম, সেই নির্জ্জন আম্রকানন যেখানে জীবনের কঠিন পরীক্ষার দিনে মাটিতে লুটাইয়া ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং তাঁহার পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম—সেই সকল স্থানই আমাদের কাছে বিশেষ পবিত্র বলিয়া মনে হয়। আমাদের এই অনুভূতি মিথ্যা নহে। তথাপি এ কথাও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে সকল স্থানই ঠিক ঐ সকল স্থানের ন্যায় পবিত্র। শুধু তিনি তীর্থে আছেন এ বিশ্বাস ঘোর কুসংস্কার। সকল স্থানই কাশী বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্র। সকল স্থানই মক্কা মদিনা ও জেরুসালেম। মন্দিরের মধ্যে তিনি যেমন সত্যরূপে বিরাজিত, মন্দিরের বাহিরেও তাঁহার বিদ্যমানতা তেমনি সত্য। তিনি সর্ব্বস্থান পূর্ণ করিয়া নিত্যকাল বিরাজিত।

তিনি প্রতি মুহূর্ত্ত আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তিনি যেমন তোমার নিকটে আছেন যাহাকে জঘন্য পাপী মনে কর তিনি তাহারও তেমনি নিকটে আছেন, এবং মহা সাধুর যত কাছে আছেন, তোমা হইতে তাহার অপেক্ষা একটুও অধিক দূরে নহেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন বলিয়াই আমাদিগকে পরীক্ষা করেন, সুখ দুঃখ এবং শান্তি অশান্তির ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে শিক্ষাদান করেন, বিপদ আপদে তিনি আমাদিগের চিরবন্ধু এবং নিত্যাশ্রয়। এই বিশ্বাসের মধ্যে সান্ত্বনা এবং বল নিহিত আছে। পাপপ্রলোভনের সহিত সংগ্রামে এই বিশ্বাস আমাদিগকে রক্ষা করে।

আমাদের বাসগৃহে এবং কার্য্যালয়ে, আমাদের প্রতিদিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে কি আমরা তাঁহাকে দেখি? যখন আমরা ভ্রমণ করি বা বিশ্রাম করি বা শয়ন করি, তখন কি মনে হয় যে সঙ্গে সঙ্গে তিনি আছেন? আমাদের গৃহ কি ঈশ্বরের গৃহ? আমাদের পুত্র কন্যা কি ঈশ্বরের সন্তান? আমাদের কাজকর্ম্মগুলিকে তাঁহার আদিষ্ট বলিয়া কি আমরা অনুভব করি? তিনি যে শুধু আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন একথা বলিলেও যথেষ্ট হয় না, কারণ তিনি আমাদের অন্তর্য্যামী। এই কথা স্মরণ রাখিলে আর আমাদের জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় না এবং আমাদের দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজকর্ম্মগুলিকেও সামান্য বলিয়া মনে হয় না। তখন অবসাদ চলিয়া যায় এবং অন্তঃকরণ জলন্ত উৎসাহে পূর্ণ হয়। অনেকদিন রুদ্ধগৃহে বাস করার পরে গিরিপৃষ্ঠের মুক্ত বায়ু যেমন আমাদের দেহে নব স্ফূর্ত্তি দান করে সেইরূপ আমাদের দৈনিক জীবনের কাজকর্ম্ম যে ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যভার ইহা অনুভব করিলে হৃদয় মন নূতন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। উৎকণ্ঠা ও ভয়বিপদের মধ্যে তাঁহার বর্ত্তমানতা স্মরণ করিলে মানুষ কত বল ও সাহস লাভ করে। যখন পুত্র বিদেশে চলিয়া যায় পিতামাতা এই কথা মনে করিয়া কত সান্ত্বনা লাভ করেন যে যে ঈশ্বর তাঁহাদের নিকটে আছেন তিনিই পুত্রের নিকটেও থাকিবেন এবং পুত্রকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যে শোকের আঘাতে বুক ফাটিয়া যায় এমন শোক যখন আমাদের জীবনে উপস্থিত হয়, যখন মুমূর্ষু প্রিয়জনের শয্যাপার্শ্বে আমরা নীরবে দণ্ডায়মান হই, যখন তাঁহার পরিত্যক্ত জড় দেহকে আমরা চিতার অগ্নিক্রোড়ে সমর্পণ করি—তখন একমাত্র ঈশ্বরই অশরীর আত্মাকে পরলোকভবনে দর্শন করিবার দিব্য চক্ষু আমাদিগকে দান করেন।

ঈশ্বর যে সর্ব্বব্যাপী এই বিশ্বাস আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে পবিত্র করে। কোন একটা বিশেষ কাজ সমাধা করিব বলিয়া যখন আমরা সঙ্কল্প করি, চিন্তা ও বিবেচনা পূর্ব্বক কোন কাজ জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করি, যখন ভগবানের চরণে জীবন উৎসর্গ করি, কোন বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় যখন তাঁহার নিকটে আর একজনের ভার গ্রহণ করিলাম বলিয়া প্রতিজ্ঞা করি,—তখন শুধু মানুষ নয় কিন্তু ঈশ্বরও যে আমাদের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিতেছেন একথা যেন বিস্মৃত না হই। যদি নিষ্ঠুর বাক্যবাণে অপরের বক্ষঃ বিদীর্ণ করি, যদি এক জনের কর্ণে অস্ফুট মৃদুস্বরে আর একজনের নামে কলঙ্ক ও কুৎসা ঢালিয়া দিই, যদি সাধুতাকে বিদ্রূপ করি ও মহত্ত্বকে উপহাস করি—তখন যেন স্মরণ করি যে আর একজন সেখানে উপস্থিত আছেন ও আমাদের সকল কথা শুনিতে পাইতেছেন।

তোমার গৃহকে কি তাঁহার উপযুক্ত মন্দির করিয়াছ? তোমার পরিবারে কি প্রেম, সহিষ্ণুতা, ন্যায়পরতা, বিনয়, সংযম, সত্যনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? তোমার বাড়ী হইতে অসার আড়ম্বর, বৃথা গর্ব্ব, সংসারিক অভাবের জন্য উৎকণ্ঠা ও সর্ব্বপ্রকার মিথ্যা ব্যবহার কি বিদুরিত করিয়াছ। তোমার গৃহে কি দাসদাসীদের প্রতি সুমিষ্ট কথা ও সুকোমল ব্যবহার আছে? তোমার পরিবারের সকলে কি পরস্পরের প্রতি সেবাযত্নের বন্ধনে আবদ্ধ? যদি প্রতিদিনের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে তোমার

ধর্ম্মের স্থান না থাকে—তবে নিশ্চয় জানিও তোমার ধর্ম্মের কোন মূল্য নাই। মনে কর তোমার একখানি দোকান আছে; প্রলোভন আসিয়া কাণে কাণে বলিল, "জিনিসপত্রের সঙ্গে কিছু কিছু ভেজাল মিশাও, নতুবা লাভ হইবে কেন? আর এ কর্ম্ম সকলেই তো করিয়া থাকে"—তখন সেখানে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন একথা কি মনে হয়? মনে কর তুমি উকীল; যখন তুমি মক্কেলের নাম করিয়া সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বল, তখন সত্যস্বরূপ যে সেখানে উপস্থিত আছেন সেকথা কি স্মরণ কর? মনে কর তুমি বিচারক; তুমি কি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ কর এবং একথা মনে রাখ যে সকল বিচারকের বিচারপতি যিনি সেই ধর্ম্মরাজ স্বয়ং তোমার বিচারগৃহে বিদ্যমান আছেন? হয় ত তুমি একজন ডাক্তার; যে সকল জীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত লোক তোমার হাতে তাহাদের চিকিৎসার ভার সমর্পণ করিয়াছে তাহাদের প্রতি ব্যবহারে তুমি কি কঠোর সত্যনিষ্ঠা পালন কর? যখন রোগ নির্ণয় করিতে না পার বা চিকিৎসায় ভুল কর, সত্যস্বরূপের দিকে চাহিয়া তাহা কি স্বীকার কর?

আমাদের দৈনিক জীবনে ঈশ্বরদর্শন সাধন করিতে করিতে আমরা সকল নরনারীর মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইব। তখন আমরা সকলের আত্মাতে ঈশ্বরকে পরমাত্মারূপে দর্শন করিব। এখন ত আমরা মানুষের মধ্যে সাধুতা দেখিতে পাই না; কিন্তু তখন আমাদের দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে। সকলের মধ্যে, এমন কি যাহাদিগকে আমরা অতি জঘন্য বলিয়া মনে করি, তাহাদেরও মধ্যে ঈশ্বর আছেন ইহা তখন দেখিতে পাইব।

তখন আশ্চর্য্যরূপে প্রকৃতিতে আমরা তাঁহার দর্শন পাইব। লোকে আক্ষেপ করিয়া বলে যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়, প্রকৃতির রহস্য আর পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিগকে বিস্ময়ে মুগ্ধ করে না। পাহাড় পর্ব্বতের নিঃশব্দ গাম্ভীর্য্য, অরণ্যের মর্ম্মর ধ্বনি, তটিনীর কলতান এবং সমুদ্রের উন্মত্ত নৃত্য ও বিপুল হুঙ্কারে আর তেমন করিয়া মনপ্রাণ মাতিয়া উঠে না, শরীর আর তেমন করিয়া রোমাঞ্চিত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপীরূপে দর্শন করিতে শিখিলে আমাদের এই ঔদাস্যও দূর হইয়া যাইবে। তখন বুঝিব যে জড়ের শক্তি তাঁহারই শক্তি, জগতের প্রত্যেক ঘটনার অন্তরালে তাঁহারই সাক্ষাৎ হস্ত, প্রকৃতির নিয়ম তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালী। তখন অনুভব করিব যে তিনিই প্রকৃতির রহস্য ও সৌন্দর্য্যের উৎস।

ভগবান যে সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বব্যাপী এই কথা যদি আমরা সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিতাম তবে আমাদের হৃদয় কত শুদ্ধ ও পবিত্র হইত, আমাদের জীবন অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও গৌরবে পূর্ণ হইত!

ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন্ স্থান থাকিতে পারে যাহা ভগবানের বর্ত্তমানতার বাহিরে? আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি যে সকল স্থান তাঁহার আবির্ভাবে পূর্ণ ও তিনি সর্ব্বভূতে বিরাজিত। আমরা সকলেই এ কথা মতে মানি। কিন্তু এই মত বুদ্ধিগত বিশ্বাস মাত্র। দীর্ঘ পরিচয়ের ফলে যে সত্য পুরাতন হইয়া গিয়াছে ও যাহার গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, সাধনবলে সেই মহাসত্যকে জীবন্ত ভক্তিতে ও চিরনবীন অনুরাগে পরিণত করিতে হইবে।

প্রতিবাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

শ্রীপ্রেমানন্দ সিংহ এম্-এ বি-এল মহাশয়ের লিখিত গত জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত "কুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকার" প্রবন্ধে তিনি কুরুগণের দাবী সমর্থন করিয়াছেন। তাহার বিপক্ষে আমার কতিপয় সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেগুলি নিম্নে বলিলাম।

(১) পাণ্ডু বনগমন করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা ত' প্রমাণ হয় না যে তিনি সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে কোন স্থানে তাঁহার প্রব্রজ্যাগ্রহণের উল্লেখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের মনে হয় তিনি স্বাস্থ্যানুরোধেই হউক বা অন্য যে কোন কারণেই হউক বনে বাস করিতে বা বনবিহার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন মহাভারতে এরূপ কোন উল্লেখ আছে কি? সুতরাং মাত্র বনবিহারের উদ্দেশ্যে বনে গমন করাতেই যে সিংহাসনে তাঁহার স্বত্বস্বামিত্ব সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে তাহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বরং সমুদয় মহাভারত আলোচনা করিয়া মনে হয় যে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজ্যপরিচালনার ভার বা সিংহাসনে জীবনস্বত্ব দিয়াছিলেন। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্র সিংহাসন ত্যাগ করিলে সিংহাসনের অধিকার পুনরায় পাণ্ডুতেই এবং পাণ্ডুর অবর্ত্তমানে পাণ্ডুর উত্তরাধিকারিগণেতেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত। অতএব যুধিষ্ঠিরের দাবীই ন্যায়সঙ্গত।

পাণ্ডুর স্বাস্থ্য জন্মাবধিই মন্দ, তাহা তাঁহার "পাণ্ডু" নাম হইতেই এবং মাদ্রীবক্ষে অকালে প্রাণত্যাগ হইতেই

বুঝা যায়। সুতরাং স্বাস্থ্যলাভার্থে বনগমন তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে।

(২) জীবনস্বত্বের কথা স্বীকার না করিলেও অন্যদিক হইতেও যুধিষ্ঠিরের দাবী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। মহাভারত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে কুরুপাণ্ডব একান্নবর্ত্তী ছিলেন এবং এক পরিবারভুক্তের ন্যায়ই ছিলেন।

মহাভারতে দেখিতে পাই যে তৎকালে জ্যেষ্ঠেরই সিংহাসন লাভের (অর্থাৎ primogeniture এর) নিয়ম ছিল। যথা ভীষ্ম সিংহাসন ত্যাগ করিলে তবে তাঁহার কনিষ্ঠ সিংহাসনে অধিকার পাইলেন। সুতরাং এই নিয়ম অনুসারে একই পরিবারভুক্ত কুরুপাণ্ডবগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হওয়াতে যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনদাবীই ন্যায়সঙ্গত এবং আইনসঙ্গত। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে তৎকালে কুরু ও পাণ্ডবগণকে দুইটি ভিন্নপরিবাররূপে গণনা করা হইত না, কিন্তু ঐ দুই পরিবারকেই একই রাজপরিবার বলিয়া গণ্য করা হইত। মহাভারতেই আমরা ইহার প্রমাণ দেখি। একই পরিবাররূপে গণ্য হওয়াতে উক্ত পরিবারস্থ সকল কুমার একই দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতেন, একত্র আমোদ আহ্লাদ বনবিহারাদি করিতেন ইত্যাদি।

(৩) এতদ্ভিন্ন মহাভারতে স্পষ্টই আছে, যে ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎকালে যিনি যুবরাজ হইতেন তিনিই রাজার মৃত্যুর পর সিংহাসন পাইতেন। রামায়ণেও সেইজন্য দেখিতে পাই দশরথ রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছেন। অতএব এই ক্ষেত্রেও ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে যুবরাজ না করিয়া যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তদ্দ্বারাই কি যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে দাবী ও অধিকার ও দুর্য্যোধনের অনধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন না?

প্রেমানন্দ বাবু "যুবরাজ" শব্দের অর্থ যুবক রাজা করিতেছেন কিন্তু কেবলমাত্র তাঁহার মতবাদ বা theoryকে রক্ষা করিবার জন্য যুবরাজ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ ত্যাগ করা কি সমীচীন?

প্রেমানন্দ বাবু এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতেও কেবল দুই এক স্থলে দুর্য্যোধনকে "মহারাজ" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া সেই সকলের উপর বিশেষ ঝোঁক দিয়া দুর্য্যোধনের দাবী সমর্থন করিতেছেন। কিন্তু সেই সকল সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে এই সকল স্থূল স্থূল বিরুদ্ধ প্রমাণ থাকায় ঐরূপ দু এক জায়গায় "মহারাজ" বিশেষণ মহামতি ভীষ্মের উক্তি হইলেও হয় তাহা জিহ্বাচ্যুতি বা slip of tongue বলিতে হইবে অথবা তাহা বিশেষ অর্থবাদ ধরিতে হইবে। মাত্র ঐরূপ দুই একটী বিশেষণের সাহায্যে দুর্য্যোধনের সিংহাসনের দাবী সমর্থন করা সঙ্গত মনে হয় না। ইতি

বিনয়াবনত

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি বি-এল।

নানা কথা।

দীর্ঘায়ু পুরুষ—বাগদাদের ১৩ই জুনের সংবাদে প্রকাশ যে, মোশলের একটী সংবাদপত্র লিখিতেছেন যে, স্থানীয় একজন সেখ ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। তিনি ১১০ বৎসর বয়সে একটী পুত্রসন্তান লাভ করেন—পুত্রটী এখনও বাঁচিয়া আছে। তাঁহার ৪টী পত্নী, ১০০টী সন্তানসন্ততি ও নাতি নাত্নী আছে। মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত শক্তি বজায় ছিল।

আনন্দবাজার পত্রিকা—৩রা আষাঢ়, ১৩৩৩।

নারীর পরিচ্ছদ—আমেরিকার বেষ্টন সহরে আর্কবিশপ ওকলেল বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমাদের খৃষ্টান নারীদিগের আজকাল শ্লীলতার অভাব দেখা যাইতেছে। আজকাল ফ্যাসনদুরস্ত হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত যেরূপ ফ্রক পরা হয়, তাহাতে অর্দ্ধোলঙ্গ বলা চলে। ইহাতে খৃষ্টীয় আদর্শের অবমাননা করা হইতেছে।" গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনী হইতে এইটুকু বড়ই মনের দুঃখে উদ্ধৃত করিলাম। বিলাতী ঢং হইল ফ্যাসনের দাসত্ব। কিন্তু এই দাসজাতির উপর সেই ঢং যে বড়ই বেশী প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং এই জাতিকে উঠিতে দিতেছে না, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। এরূপ পরিচ্ছদে শুধু খৃষ্টীয় আদর্শের নহে, সমগ্র মনুষ্যত্বের অবমাননা করা হয়। তাহা যদি না মনে কর, তবে অভিধান হইতে হ্রী, শ্লীলতা প্রভৃতি শব্দসমূহ উঠাইয়া দাও। সেদিন দেখি, এক বঙ্গমহিলা (অন্য বিষয়ে পুরোদস্তুর রক্ষণশীল হিন্দু) চৌরঙ্গী রাস্তার উপর অথবা রাস্তার উপর এক দোকানে (আমার ঠিক মনে নাই) দণ্ডায়মান থাকিয়া বিজ্ঞাপনের পুতুলের মত জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি যথাসাধ্য হাঁটুর উপরে skirtএর ধরণে অতি ফিনফিনে শাড়ী এবং বুককাটা ও পিঠকাটা জ্যাকেট পরিয়াছেন এবং বাহুদুটী পুরোদস্তুর মেমসাহেবী ঢঙ্গে বাহুমূল অবধি খোলা রাখিয়াছেন। আর একদিন হগ মার্কেটে দেখি, এক সুন্দরী মহিলা রক্ষণশীল হিন্দুগৃহের কুলবধূ, অতি ফিনফিনে কাপড়ের পোষাক পরিয়া অকাজের কাজ হিসাবে যেন কি একটা কাজ ভুলিয়া গিয়াছেন এই ভাব প্রকাশ করিয়া বাজারের যে অংশে বড় ভিড় হয়, সেই অংশে ক্রমাগত পায়চারি করিতেছেন—সকলে তাঁহার রূপ হাঁ করিয়া গিলিতেছে,

তাহাতেই তাঁহার তৃপ্তি। হিন্দু বল, ব্রাহ্ম বল, খৃষ্টান বল, ইঙ্গবঙ্গ বল, সমাজের মধ্যে যে ঘুণ প্রবেশ করিতেছে, এখন অবধি সতর্ক হইয়া তাহাকে আটকাইবার ব্যবস্থা না করিলে আর কয়েক বৎসরের মধ্যে বোধ হয় অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

ইংলণ্ডে সন্ন্যাসিনী—আমাদের মন তবে প্রফুল্ল হইবার অধিকার রাখে—বিলাতেও তাহা হইলে এমন সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম আছে, যাঁহারা মৌনব্রতী এবং ১০ বৎসরের মধ্যে আশ্রমের সীমার বাহিরে পদ-নিক্ষেপ করেন নাই। ইহাঁরা রোমান ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্ট, কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহা বুঝিলাম না। অবশ্য ইটালিতে রোমান ক্যাথলিকদিগের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় আছে, সে সম্প্রদায়ের নাম "নীরব ভগ্নী-সম্প্রদায়"। কোন মহিলা এই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া অবধি কথা বলেন না। আমরা ১৮৪৮ শকের আষাঢ়-সংখ্যার পত্রিকাতে এবিষয়ের বিবরণ লিখিয়াছিলাম। দেখা যাইতেছে যে, এই সম্প্রদায় সংযমের বহিরাকারকে অতি-মাত্র আঁকড়াইয়া আছেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, জনৈক মহিলা উঠিয়া পড়িয়া তাঁহাদিগকে ভোট দেওয়া-ইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন—বোধ হয় সফল হইয়া থাকিবেন। ভোট দেওয়াইবার জন্য ঘেরাটোপবিশিষ্ট মোটরেরও নাকি বন্দোবস্ত হইয়াছিল! আর আমাদের দেশে মহিলাগণ ভোট দিবার ও দেওয়াইবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছেন! সূর্য্যদেব বোধ হয় শীঘ্রই উল্টা দিকে উঠিতে বাধ্য হইবেন।

বঙ্গে বরফ-বার্ত্তা—আজকাল আমরা যে বরফ পাই, সে সমস্তই কলে প্রস্তুত। কিন্তু এদেশে ইউরোপীয়-গণের প্রথম পদার্পণকালে বরফের কল ছিলই না। সেকালে জাহাজে মার্কিণ মুলুক হইতে বরফ আমদানি হইত; এ বিষয়ে গত ৩০ জুনের ষ্টেটস্‌ম্যান কাগজে যাহা বাহির হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে বলিতেছি। '১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মার্কিণ দেশের সঙ্গে ইংলণ্ডের বরফ-কারবার চলিয়াছিল; বোষ্টন সহরের নিকটে ওয়েনহ্যাম হ্রদ হইতে বরফ তোলা হইত। এই স্থান হইতে বরফ উত্তর আমেরিকার অন্যান্য দেশে, ভারতবর্ষে এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও চালান হইত। যাত্রাশেষ বন্দরসমূহে বরফ রাখিবার আড়তঘর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঘোটকচালিত দোমুখো করাতের দ্বারা চৌকা আকারে বরফ কাটা হইত। সেই চৌকাগুলো খুব আঁটিয়া একসঙ্গে বাঁধা হইত, যাহাতে সমস্তগুলি জমাট বাঁধিয়া solid mass, দাঁড়ায়। জাহাজের "খোলে" মোটা কাঠের একটা planking এবং তাহারও পশ্চাতে tanএর মোটা স্তর থাকিত। এই উপায়ে তখনকার টিমাচাল পালবিশিষ্ট জাহাজের দিনেও কলিকাতা পর্য্যন্ত বরফ আসিত। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে প্রায় এক তৃতীয় অংশ গলিয়া নষ্ট হইত; আরও শতকরা ১০।২০ অংশ ভাগীরথী ধরিয়া আসিবার পথে নষ্ট হইত। একবার এক জাহাজে বরফ ভাল করিয়া বাঁধাছাঁদা হয় নাই। সেই জাহাজে কেরোসিন তেলও আসিতেছিল—সেই টিনগুলা হইতে তেল চুঁয়াইয়া বাহির হইয়াছিল। ফলে বরফেও কেরো-সিনের গন্ধ হওয়ায় সে বৎসর বরফের খুবই অভাব হইয়াছিল। মার্কিনের পর নরওয়ে দেশ হইতে বরফ আসিতে লাগিল—দেশটা অপেক্ষকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া ক্ষতিও কম হইতে লাগিল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে নরওয়ের এই বরফ ৫০৫,০০০ টন আমদানি হইয়াছিল, আর তাহার মূল্য হইয়াছিল ৩,১৭০,০০০ পাউণ্ড। তাহার পর বরফের কলের সূত্রপাত হইল। তবু দেখা যায় যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দেও আমদানি হইয়াছিল ২৩৯,০০০ টন—দাম ১২৭০০০ পাউণ্ড।' লেখক কিন্তু একটা কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন। সেকালের কলিকাতার ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম মনে হইতেছে যে, হুগলির কোন্ এক মাঠে শিশির পড়িয়া বরফ হইয়া থাকিত। সেগুলি ধরিয়া রাখিয়া নবাব-ওমরাহদিগের ভোগে আসিত। আশ্চর্য্য যে সেই একটী মাঠে মাত্র ঐ প্রকার ঘটনা দেখা যাইত, অন্য মাঠে নহে। তাই সেই মাঠ "বরফের মাঠ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। জানিনা, এখনও সে মাঠ আছে কি না।

আসানসোলে পূর্ণিমা সম্মেলন—গত ৩০শে জ্যৈষ্ঠের সঞ্জীবনীতে শ্রীমতী রাজবালা দেবীর একটী পত্র এবং তন্নিম্নে শ্রদ্ধাস্পদ সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য লিপি-বদ্ধ দেখিলাম। উক্ত মন্তব্যে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি" লিখিত আছে। আমরা আমাদের standpoint একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চাই।

আমরা আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের বিরোধী নহি। শুধুই যে নির্দ্দোষ সঙ্গীত বা Piano সেতার এস্রাজ প্রভৃতি যন্ত্রাদির সাহায্যে বাদ্যাদিই এই আমোদের উপকরণ হইবে, আমরা তাহা মনে করি না। 'বাল্মীকিপ্রতিভা'র ন্যায় বিষয় যদি নির্দ্দোষভাবে আত্মীয়স্বজন বা বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে অভিনীত হয়, তাহাতে ক্ষতির পরি-বর্ত্তে লাভেরই সম্ভাবনা বেশী মনে করি। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 'বাল্মীকিপ্রতিভা', 'কালমৃগয়া' প্রভৃতিতে galleryকে মুগ্ধ করিবার মত নৃত্যগীতের কোনই ব্যবস্থা নাই, এবং তাহার বিশেষ অবকাশও নাই। টিকিট করিয়া, নারীর মর্য্যাদারক্ষণে শুধু মুখে নয় অন্তরেও অনভিজ্ঞ ও অক্ষম নামে মাত্র আত্মীয়স্বজন বা

নামেমাত্র বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া নৃত্য ও তদুপযোগী গীতাদি সহ অভিনয় প্রদর্শন করার, অথবা সদনুষ্ঠানের নামে টিকিট বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায়স্বরূপে উৎকৃষ্টতম বিষয়ও অভিনয় করার আমরা সম্পূর্ণ বিরোধী —কারণ এই স্থলেই thin end of the wedge আসিয়া পড়ে। বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবই হউক বা খুব নিকট আত্মীয়স্বজনই হউক, কাহারও সম্মুখে যে মহিলানৃত্য সহ অভিনয়াদি করা উচিত নহে, তাহা বলা বাহুল্য। কোন একটী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে এইরূপ একটী নৃত্যসহ অভিনয়ের আয়োজন হইয়াছিল এবং সেখানে কেবলমাত্র ঐ সকল অভিনেত্রী ছাত্রীদিগের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নৃত্যশীলা অভিনেত্রীদিগের সম্বন্ধে তাঁহারা যে প্রকার অভদ্রোচিত অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিলেন, সে সকল শুনিলে এজন্ম পরিত্যাগ করিয়া নবজন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের শৈশবে কোন আত্মীয়ের গৃহে এক গীতিনাট্যের অভিনয় দেখিয়াছিলাম। এখন মনে হয় তাহা না দেখিলে ছিল ভাল। ইংলণ্ডে যেমন আমোদপ্রমোদ বন্ধ করিবার ফলে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিয়াছিল, আমরা সে প্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা আনয়নের সহায়তা করিতে ইচ্ছা করি না। সেই কারণে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ—এমন কি, নির্দ্দোষ ennobling বিষয়ের নির্দ্দোষ প্রণালীতে সঙ্গতভাবে অভিনয় করারও আমরা বিরোধী নহি। পূর্ণিমা সম্মেলনে যখন কেবলমাত্র মহিলাগণের সম্মুখে মহিলাদিগের দ্বারাই 'বাল্মীকিপ্রতিভা' অভিনীত হইয়াছিল এবং "কোনও প্রকাশ্য বা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পুরুষদের সামনে কোনও কুলবধূদের নৃত্যগীতাদি হয় নাই" তখন ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতে পাইতেছি না। আশা করি, উক্ত অভিনয় উপলক্ষে মহিলাদের সম্মুখেও কোন প্রকার মহিলানৃত্য বা বালিকানৃত্যও প্রদর্শিত হয় নাই। তাহা যদি হইয়া থাকে, তবে তাহাকে আমরা নিশ্চয়ই thin end of the wedge বলিব এবং দৃঢ়তার সহিত প্রতিবাদ করিব। শ্রীমতী রাজবালা দেবী প্রভৃতি পূর্ণিমা সম্মেলনের উদ্যোক্ত্রীদিগকে বলিতে চাই যে, ভবিষ্যতের সন্তানসন্ততির মঙ্গল উদ্দেশ্যে মহিলানৃত্যের বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়া আসিতেছি, সেগুলি তাঁহারা ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিবেন।

সঞ্জীবনীর সৎসাহস—শ্রীহট্টের কুমার গোপিকারমণ এবং তাঁহার পত্নী সুরুচিবালা অভিনয়ের দ্বারা আসামের বন্যাপ্রপীড়িতদিগের জন্য অর্থসংগ্রহে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাঁদের কর্ম্মচারী সঞ্জীবনীতে উক্ত অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য গিয়াছিলেন। আমরা বড়ই সুখী হইলাম যে সঞ্জীবনী বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে শুধু অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তদুপরি দুই চারিটী সত্য কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। আমরা তো প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, অনেক সাময়িক পত্রের একদিকে সুনীতির সপক্ষে প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, অপর দিকে সেই সংখ্যাতেই দুর্নীতিপ্ররোচক মহিলানৃত্য, এবং বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত অভিনয়ের বিজ্ঞাপন লোভনীয় ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। পিতা পুত্রকে উপদেশ দিতেছেন :মদ খাইও না, অথচ তিনি পুত্রের সম্মুখে মদ খাইয়া মাতাল হইতেছেন, এই প্রকার কার্য্যের সহিত ঐ সকল সাময়িক পত্রের কার্য্য তুলনীয়। রঙ্গমঞ্চে দুর্নীতিকে কিরূপে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তাহা সকলেই জানেন। আমরা তাহার উপরে আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। একজন থিয়েটরের নিয়মিত দর্শক এই দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেন। কোন থিয়েটরে একটী নাটিকা অভিনয় হইতেছিল। সেই নাটিকাতে পরীর আবির্ভাবের কথা আছে। পরী নামানো হইল। কিন্তু তাহারা পরী কি না, সুতরাং তাহাদের পরিচ্ছদ সূক্ষ্মতমভাবে করা হইল। উক্ত দর্শকের সম্মুখে আরও দুইজন নিয়মিত দর্শক জমীদার বসিয়াছিলেন তাঁহারা পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইলেন—'এ কি— নারীর মর্য্যাদায় এপ্রকার আঘাত সহ্য করা যায় না' ; ইহা বলিয়া তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। রঙ্গমঞ্চের সাহায্যে এই প্রকার দুর্নীতিপ্রসারের ফলে দর্শকদিগের হৃদয় অগ্নিময় হইয়া উঠিলে, তাহার পর কি ইহা আশা করা যায় যে তাহারা পল্লীগ্রামে বৎসরান্তে দুই একমাস বাস করিতে গিয়া হঠাৎ সাধু বনিয়া যাইবেন এবং নারীধর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যে বিরত হইবেন? প্রত্যেকে নিজের নিজের বুকে হাত দিয়া আমাদের কথা সত্য কি না বলুন। সত্য যদি হয়, তবে তাঁহারা বেশ্যারা যেখানে অভিনয় করে, সেই সকল public theatre সর্ব্বতোভাবে বয়কট করুন এবং সংবাদপত্রসমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহাদের বিজ্ঞাপন প্রকাশে বিরত হউন। আমাদের পরাধীন দেশে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যহানিকর এপ্রকার ঘৃণিত উপায়ে অভিনয় চালানো ও তাহার এতটুকু সাহায্য করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ধর্ম্মবক্তা সঞ্জীবনী সম্পাদক মহাশয় বেশ জানেন এবং আমরাও পড়িয়াছি যে, সকল ধর্ম্মেরই উঠতিমুখে প্রথম প্রচারকদিগকে ভীষণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। সেই সকল দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে এবং আমাদিগকে দুর্নীতি ও পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ফলে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে, তাহা বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন সংগ্রামে নামিয়াছি, তখন ভগবানের পতাকাতলে দাঁড়াইয়া রক্তের শেষবিন্দু থাকিতে পশ্চাৎপদ হইব না এবং সংগ্রামের শেষ ফল প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত সংগ্রামে বিরত হইব না।

ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং ॥

গ্রন্থপরিচয়।

জাগান পরশ—একটী ক্ষুদ্র নাটিকা। ক্ষুদ্র হইলেও মধুর। আমরা এই নাটিকাটি পড়িয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। গানগুলি সুরচিত। ভাষা সরল ও স্বচ্ছ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দ্বারা নিঃসঙ্কোচে অভিনয় করান যায়। ইহার অন্তর্নিহিত মধুর সুর পাঠক-পাঠিকাকে অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্যও পৃথিবীর এই মলিনতা হইতে উর্দ্ধে লইয়া যায়, ইহাই হইল এই ক্ষুদ্র নাটিকাটির বিশেষত্ব। রচয়িতা ও প্রকাশকের নাম নাই। মূল্যও অজ্ঞাত।

সংবাদ।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব—ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব গত ৭ই আষাঢ় হইতে ৯ই আষাঢ় রবিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ধরিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শেষ দিবস শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিন্তামণি বাবু যথারীতি উদ্বোধনান্তে স্বাধ্যায় পাঠ করিলে বেদান্ততীর্থ ক্ষিতীন্দ্রনাথের পুস্তিকায় গ্রথিত উপদেশ "উপাস্য কে?" পাঠ করেন। পুস্তিকাগুলি সভায় সমবেত উপাসকবর্গকে বিতরিত হয়। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

পুণ্যাহ—গত ১৬ই আষাঢ় রবিবার কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে 'কালীগ্রাম'-পরগণার শুভ 'পুণ্যাহ'-কর্ম্ম পতিসর সদর কাছারীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষ্যে আহূত হইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ৯॥ ঘটিকায় প্রচুর বাদ্যোদ্যম ও ঐশ্বর্য্যোচিত আড়ম্বর সহ পুণ্যাহের শুভ সূচনা দিকে দিকে বিঘোষিত হয়। অতঃপর পত্রপুষ্প প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত সভাগৃহ আমলা কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ হইলে বেলা দশ ঘটিকায় ষ্টেটের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করেন। বেদান্ততীর্থমহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনান্তে সমবেত প্রজাগণকে উদ্দেশ করিয়া পুণ্যাহ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমবেত প্রজাপুঞ্জ ও অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অপরাহ্নে দধি-চিপিটকের সুবৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—পত্রিকাখানি বিগত বৈশাখে ৮৭ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। ভারতে দেশীয় ভাষায় এরূপ দীর্ঘজীবী পত্রিকা আর একখানিও নাই। ভারতের নবযুগের একটী নূতন ধর্ম্ম ও নবসাহিত্য তত্ত্ববোধিনীর এই সুদীর্ঘ জীবনধারার সহিত ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্ববোধিনী সত্যধর্ম্মের পতাকাবহন করিয়া সকল পাঠকেরই যে মনোরঞ্জন ও প্রীতিবর্দ্ধনে সমর্থ হইতেছে, ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। নানা সাময়িক পত্রে ও চিঠি-পত্রে আমরা মাঝে মাঝে ইহার নিদর্শন পাই। 'সঞ্জীবনী', 'শিশির' 'শিক্ষাসমাচার' 'দৈনিক বঙ্গবাণী' প্রভৃতিতে পত্রিকার প্রবন্ধ ও মন্তব্যাদি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইতেছে। তত্ত্ববোধিনীকে যাঁহারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আশা করি এ সংবাদে তাঁহারা সুখী হইবেন।

উপনিষৎপাঠ—বুধবারের উপাসনান্তে উপনিষৎপাঠ নিয়মিত চলিতেছে। গত ২৬শে আষাঢ় বুধবার ঈশোপনিষৎ পাঠ ও আলোচনা সুসম্পূর্ণ হইয়াছে; এবার কেনোপনিষদের পাঠ ও আলোচনা সত্বর আরম্ভ হইবে। ঈশোপনিষদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে দৈবযোগ ও ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে, উহা যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই তাহার জন্য কেবল মাত্র উহার পাঠ ও ব্যাখ্যায় তৃপ্ত না হইয়া শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে উহার একটী সুন্দর সংস্করণ প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে।

মেডিক্যাল মিশন—আমরা পত্রিকার গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় জানাইয়াছিলাম যে, দুইজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের স্বতঃপ্রবর্ত্তিত সাহায্য পাইয়া আমরা সত্বরই পুনর্ব্বার 'মেডিক্যাল মিশন' খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছি। সাধুহৃদয় ব্যক্তি ও হিতৈষী বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, গত ২৪শে আষাঢ় সোমবার পূর্ব্বাহ্নে রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে 'মেডিকেল মিশন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে বেলা ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে বেলা ৫॥টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ডাঃ শ্রীরাজেন্দ্রলাল ধর ও ডাঃ এ, পি, সিং পরস্পর সহযোগিতায় সমবেত রোগীদিগকে সযত্নে পরীক্ষাপূর্ব্বক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। এই মিশনের উন্নতিকল্পে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যিনি যাহা দান করিবেন, সাদরে গৃহীত হইবে এবং উহার হিসাব পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ভগবান তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে আমাদিগের সহায় হউন।

——

গার্হস্থ্যসংবাদ।

নামকরণ ও অন্নপ্রাশন—গত ২৪শে আষাঢ় সোমবার আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ার পুণ্যলগ্নে ৺তারিণীচরণ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুহৃৎকুমার গুপ্তের শিশুপুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন-সংস্কার আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে তাঁহাদের শ্রীরামপুরের বাসভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শিশুটীর নাম শ্রীমান শ্যামলকুমার দেওয়া হইয়াছে। ভগবান ইহাকে নিত্য শ্রীসৌন্দর্য্যে ও সাধুগুণে বিভূষিত করুন।

আনুষ্ঠানিক দান—শ্রীমান সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্রের নামকরণ ও অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে আমরা উহার প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন—গত ২রা আষাঢ় রবিবার ও ৫ই আষাঢ় বুধবার পূর্ব্বাহ্নে পুণ্যলগ্নে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুভগেন্দ্র, শ্রীমান সিদ্ধীন্দ্র ও শ্রীমান বাসবেন্দ্রের উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন-সংস্কার আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথভবনে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভগবান ইঁহাদিগকে ধর্ম্মের পথে নিত্য রক্ষা করুন।

ভ্রমসংশোধন।

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা পত্রিকায় 'রাজকুমার বেসসন্তর' প্রবন্ধে ৪৬ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দ 'কুমতী'র পরিবর্ত্তে 'ফুসতী' হইবে।

——

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত ভুবনমোহন।*

(শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল)

আমার এক বিদেশী নবাগত বন্ধু প্রথম দৃষ্টিতেই পণ্ডিত মহাশয়ের সৌম্য-সুন্দর গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'চমৎকার'! ইহা তিনি অকৃত্রিমভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, মানুষ যেমন প্রকৃতির অঙ্গে বিরাট নয়নাভিরাম কোনও সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হইয়া করে। আমি উত্তর দিয়াছিলাম 'তাহাতে আর সন্দেহ কি?' বন্ধু যদি ইহার পর জিজ্ঞাসা করিতেন পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রেষ্ঠতা ও ঔৎকর্ষ কোথায়, তাহা হইলে গোলযোগে পড়িতাম; কারণ পণ্ডিত মহাশয়ের জীবনী একটি বিরাট মানচিত্র বিশেষ,—ইহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপকতা, ইহার সর্ব্বাঙ্গীন বিশালতা আলোচনার বস্তু করিয়া তোলা সহজসাধ্য মনে করি না।

সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অতি ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সাহচর্য্য-লাভের সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রাদি অনেক সময়েই তিনি আমাকে দিয়া লিখাইয়াছেন। এই সব কারণে অপর দশ জনের অপেক্ষা তাঁহাকে জানিবার বেশী সুযোগ হয় ত পাইয়াছিলাম। কিন্তু কবির কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিতে পারি যে, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানেরই জগতজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে। আজ আমাদের গৃহকোণে যে ছেলে লেখাপড়া করিতেছে, সুক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা করিতেছে, তাহার সহিত পৃথিবীর অপর প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মনের মিল ঢের বেশী সত্য তাহার মূর্খ প্রতিবেশীর চাইতে। সুতরাং নিকটে ছিলাম বলিয়াই তাঁহাকে জানিয়াছি একথা উচ্চারণ করিতে ভয় পাই। মনে হয় তাঁহাকে ঠিকমত জানিবার শক্তিই আমাদের ছিল না। এখনও নাই। কিন্তু আমাদের জীবনপ্রবাহে তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে তাঁহার যথার্থ রূপটি ধরিবার জন্য। অভিধান উজাড় করিয়া কতকগুলি অলৌকিক বিশেষণে ভূষিত করিলেই তাঁহাকে চেনা যাইবে না।

আমরা প্রতি বর্ষে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতিসভায় সশ্রদ্ধ-ভাবে মিলিত হই; কিন্তু কি জন্য? পণ্ডিত মহাশয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল ইহা জানিতাম। সংস্কৃত-সাহিত্য ও হিন্দু দর্শনশাস্ত্র তিনি মন্থন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার কাছেই শুনিয়াছি যে কৈশোরের প্রারম্ভেই ব্যাকরণে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অধ্যাপক স্নেহভরে তাঁহাকে 'ব্যাকরণ-চঞ্চু' বলিয়া ডাকিতেন। এসব কথা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলিতে পারি যে, তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে হয় ত নির্জ্জলা পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কারণ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তখন সমগ্র বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক,—ভারতবর্ষের একজন অতিবড় পণ্ডিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে এই নগরেই এমন একজন তখনও জীবিত ছিলেন যাঁহাকে উপেক্ষা করা চলে না।

পণ্ডিত মহাশয় সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠ সতেজ ও তীক্ষ্ণ ছিল। আমরা প্রতি বর্ষে আমাদিগের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে তাঁহার বক্তৃতার আয়োজন করিতাম। গুরুতর বিষয়ে তিনি যেদিন বক্তৃতা করিতেন, সেদিন অনাহারে থাকিতেন—সে রাত্রিই হোক আর দিনই হোক। বক্তৃতার পর আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। নিজের উপলব্ধ সত্য অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হোক, বক্তৃতার

* পণ্ডিত ভুবনমোহন স্মৃতিসভার অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনে (১৯ ভাদ্র ১৩৩৫) দিনাজপুর, লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

ক্ষেত্রে ইহাই তাঁহার বোধ হয় ইচ্ছা ছিল। সেই জন্যই তাঁহার কথাগুলি শুধু সুললিত পদবিন্যাসের মালা না হইয়া ভাবের আবেগে ও ঐকান্তিকতায় জীবন্ত হইয়া উঠিত। মনে হইত, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বৈদিকযুগে বোধ করি এমনি করিয়া তপোবনে তাঁহার বাণী প্রচার করিতেন। তাঁহার বক্তৃতায় এসব গুণ থাকা সত্ত্বেও ইহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, বক্তৃতার প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে শ্রেষ্ঠ বক্তা বলিতে আমরা যাহা বুঝি বাংলা দেশে তখন তাহার অভাব ছিল না। হয় ত এখনও নাই।

ধনগৌরব পণ্ডিত মহাশয়ের কিছু ছিল না। তিনি বাহ্য সম্পদে দরিদ্রই ছিলেন। কথাবার্ত্তায় তিনি তাঁহার সামান্য পেন্‌সনের কথা অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম আলাপেও উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এবিষয়ে তিনি একান্ত দীনাত্মা ছিলেন। উপার্জ্জন তিনি জীবনে সামান্যই করিয়াছিলেন, কারণ শিক্ষাদানের অপরিসর ক্ষেত্রেই তিনি জীবনের প্রথম ভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার আয় অতি সামান্য ছিল! সে আয়ে আজ একটি অর্দ্ধশিক্ষিত কেরাণীও সন্তুষ্ট নয়।

তাহা হইলে কি পাথেয় লইয়া তিনি ক্ষুব্ধ সাগরে পাড়ি জমাইয়াছিলেন এবং আমাদিগের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন,—যেখানে ধনীর ধনগৌরব ম্লান হইয়া যাইত, অতিবড় পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যও পৌছিত না?

আমাদিগকে তাঁহার জীবন-ইতিহাসের সেই গৌরবময় উপাদানটিকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। মনে হয় শ্রেয়ের পথে দ্বিধাশূন্য ভাবে চলিয়াছেন, পথের দুর্গমতা ও বিঘ্নের দিকে তাকান নাই—এবিষয়ে তাঁহার অসাধারণ মানসিক বলই তাঁহাকে বরেণ্য করিয়া তুলিয়াছিল। এখানে তিনি 'অতিমানুষ' ছিলেন। ইহাই তাঁহার অসাধারণত্ব। পাণ্ডিত্য নয়, প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা নয়, দীনদরিদ্রকে অক্লান্তহস্তে ঔষধবিতরণ করিয়া দরিদ্র-নারায়ণের সেবার দ্বারাও নয়—পরন্তু সংসারে লক্ষ্য স্থির করিয়া চলিবার জন্য, অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবার জন্যই তিনি নমস্য হইয়াছেন। যে বাহ্য দারিদ্র্য না হইলে আত্মার শ্রীবৃদ্ধি হয় না, সেই দারিদ্র্যকেই তিনি বরণ করিয়াছিলেন। তিনি শেষজীবনে যে সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা এই সহরে বা অন্যত্র প্রভূত ধনার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি ইহা করেন নাই, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমার্থ ধনের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন, যেদিকে আমরণ তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি জানিতেন যে বাহ্যসম্পদ ও উপকরণের একটা সীমা আছে। উপকরণকে অতিকায় করিয়া তুলিলে মানবাত্মা পীড়িত হয়—যে ব্যাধি আজ পশ্চিমের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিয়া পশ্চিমকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে।

ছোট ছোট কাজের ভিতরে তাঁহার চরিত্রের বিরাটত্ব ধরা পড়িত, যেমন করিয়া ক্ষুদ্র জলাশয়ে আকাশের বিরাটত্বের আভাস ধরা পড়ে। বাঙ্গালীর মজ্জাগত অভ্যাস চাকরকে নাম ধরিয়া ডাকায়। কখনও তাহাকে 'নোকর' 'বান্দা' প্রভৃতি শব্দে ডাকিয়া দাসত্ব অনুভব করাইবার চেষ্টা আমরা করি না। বাড়ীর দাসীকে আমরা ঝি, (অর্থাৎ মেয়ে) হরির মা, ইত্যাদি নামে ডাকি। বস্তুত ছোটকে বড় করিয়া দেখিবার এরূপ সভ্যতা আর কোথাও আছে কি না জানি না। পণ্ডিত মহাশয় সেই সভ্যতারই প্রতীক ছিলেন। তাঁহার সামনে যখন কোন কসাইয়ের ছেলে, মুদীর ছেলে অথবা লোকচক্ষে তাহা অপেক্ষাও নগণ্য কেহ আসিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন 'আমাদের এই অমুক মিঞার ছেলে'—যেন তাঁহার অন্তরঙ্গ কোনও স্নেহভাজন বন্ধুর পুত্র! যাহারা সেই মিঞাটিকে জানে না পণ্ডিত মহাশয়ের বলিবার ধরণে ক্ষণকালের জন্য তাহাদেরও মনে হইত যে ছেলেটি বোধ হয় কোনও গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির। ছোটকে বড় আসন দিয়া তাহাকে বড় করিয়া তুলিবার ইহা অপেক্ষা মৌন অথচ অকৃত্রিম চেষ্টা অন্য কোথাও এত সুস্পষ্ট আকারে বড় একটা দেখিতে পাই না। ইহাতে তাঁহার আড়ম্বর ছিল না, এবং ভাবী কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্যও তিনি বলিতেন না। ইহাতে সত্যই তাঁহার যথেষ্ট আন্তরিকতা ছিল।

অনেকে জানেন ধর্ম্মবিশ্বাস তাঁহার ভিতরে কিরূপ জীবন্ত ছিল। সাধারণত এখন ধর্ম্মহীন কর্ম্ম দেখিতে পাই। ধর্ম্মবিশ্বাস অতীত যুগের জরাগ্রস্ত বস্তু—কলকব্জা, ধনিক ও শ্রমিকের আন্দোলন, নারীর অধিকারবাদ প্রভৃতি বস্তুতন্ত্রতার চাপে ধর্ম্মের শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে, ইহার মৃত্যু অনিবার্য্য একথাও শুনি। পণ্ডিত মহাশয়ের ধর্ম্মবিশ্বাসে কতখানি উপনিষদের একেশ্বরবাদের সহিত বেদান্তের মায়াবাদ মিশিয়াছিল সেকথা এখানে তুলিব না। শুধু এই বলিতে চাই যে পণ্ডিত মহাশয়ের ধর্ম্ম, তাঁহার নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ, তাঁহারই এক বিশেষ বস্তু ছিল। আমার মনে হয় ভারতবর্ষের উদার আকাশ, গভীর অরণ্যানী, বেগবতী নদী, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত হইতেই যেন তিনি তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মনিহিত বিশ্বাসে আমরা অরণ্যের স্তব্ধতা, সাগরের গভীরতা ও আকাশের বাধাহীন সীমাহীন বিস্তার দেখিতে পাই।

কথাটা হয় ত একটু বুঝাইয়া বলা দরকার।

এই ভারতবর্ষেই দেশভেদে প্রকৃতিভেদে একই দেব-

তার বিভিন্ন মূর্ত্তি দেখিতে পাই। আমাদের দেশে যে শ্যামমূর্ত্তির পূজা হয়, মীরাবাই তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই গৃহসম্পদ সবই ত্যাগ করিয়াছিলেন; অথচ মীরার দেবমূর্ত্তি কৃষ্ণমূর্ত্তি হইলেও লাবণ্য ও সৌকুমার্য্যের আধার বাঙ্গালীর কৃষ্ণমূর্ত্তি নয়—মীরার দেবতার নামও 'রণ-ছোড়'। এই কৃষ্ণমূর্ত্তি কোথাও হইয়াছে 'বালগোপাল'। কাথিবাড়ে তাহার পার্শ্বে আর রাধাকে দেখি না—মহারাষ্ট্র অঞ্চলে কৃষ্ণমূর্ত্তিও কাঠখোট্টা। বাংলা দেশের শ্যামল শস্যসম্পদ, তাহার জলধারা, ঋতুচক্র—এসবের দ্বারাই যেন মাধুর্য্যময় কৃষ্ণমূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে। এই মূর্ত্তিলীলা অবলম্বন করিয়াই বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদিগের ভাবোজ্জ্বল গানে ও পদাবলীতে অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের পশরা খুলিয়া দিয়াছেন। অন্য দেশে সে অবকাশ হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয় যেন ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক উদারতা হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক dogma অথবা cultএর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নাই। অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়ের ধর্ম্ম কাটাখাল নহে, বাঁধান সরোবরও নহে,—ইহা কালের ক্ষেত্রে ধাবিত নদী; ইহার রূপ প্রবহমান রূপ,—কদাচ কোনও স্পর্দ্ধিত তত্ত্বজ্ঞানীকে সে একথা বলিতে দিবে না যে ইহাই তাহার শেষ। যুগে যুগে নূতন পথিক এই ধারায় স্নান করিয়া—এই ধারা পান করিয়া ধন্য হইবে।

অপরের ধর্ম্মবিশ্বাসকে তিনি কদাচ আঘাত করিতেন না বলিয়া তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অপরের বিশ্বাসেরই অনুরূপ ইহা ভাবিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। একটি সন্ধ্যার কথা আমাদিগের বিশেষভাবে মনে আছে। পণ্ডিত মহাশয় উপস্থিত ছিলেন এবং আমাদিগের দুএক জনের মধ্যে সাকার-নিরাকার উপাসনার পুরাণো তর্ক উঠিয়াছিল। পাছে মূর্ত্তিপূজক কেহ কোন ব্যথা পান, সে জন্য পণ্ডিতমহাশয় অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে যাহা বলিয়াছিলেন সে উক্তি তাঁহার মর্ম্মনিহিত বিশ্বাসেরই পরিচায়ক বলিয়া মনে করি। তিনি সাকার উপাসনার কথায় বলিয়াছিলেন, 'বাবা! ধুলোকে ভাত বলে খেলে অপকার হয়, উপকার হয় না'—তাঁহার এই কথাই যথেষ্ট। কিন্তু এই বিশ্বাসের চাপে অপরের ধর্ম্মমতকে অযথা আঘাত করা তাঁহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব ছিল, কারণ এসবের অনেক উর্দ্ধে তিনি বিচরণ করিতেন। সুতরাং প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে যাহাকে আমরা আচারনিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম বলি তিনি হয় ত তাহা মানিতেন না। কিন্তু বিস্ময়ের বস্তু এই ছিল যে মূর্ত্তিপূজার নিমন্ত্রণে তিনি আসিতেন এবং পূজার প্রসাদও গ্রহণ করিতেন। এজন্য দুএকটি ব্রাহ্মের তিনি সাময়িকভাবে বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কেহ কোনও মূর্ত্তিপূজা করিতে চাহিলে কাহাকেও বলপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে উদ্যত হইতেন না। একবার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'আগেকার মেয়েরা কত ব্রত-নিয়ম উপবাসাদি করিতেন, এ-কালের মেয়েরা এসব কমাইয়া দিয়াছেন।' এখন কথা এই যে তবে কি তিনি ষষ্ঠীব্রত, তালনবমী ব্রত প্রভৃতি যে সব ব্রত-নিয়ম রহিয়াছে তাহা মানিতেন? আমার মনে হয় যে তিনি চাহিতেন, যে যে-ধর্ম্মে আছ তাহার ভিতরকার করণীয় কাজ কর। ভগবানকে যে কোনও উপায়ে মনে পড়ুক। অপরকে জোর-জবরদস্তি করিয়া নিজমতে আনিবার বিজয়-উল্লাস তাঁহার মধ্যে কদাপি ছিল না।

গত অর্দ্ধ শতাব্দী কাল তিনি আগন্তুকের চক্ষে দিনাজপুরের শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় ব্যক্তি ছিলেন। দিনাজপুরে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া না গেলে নবাগতের পক্ষে দিনাজপুরে আসাই বৃথা হইত।

'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে এই বাণীর সার্থকতা আমরা তাঁহার জীবনে দেখিতে পাই।

নিজের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহাকে যথেষ্ট ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। অপমান অত্যাচারও এক সময়ে ভাগ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জুটিয়াছে। কিন্তু আদর্শকে ক্ষুণ্ণ তিনি করেন নাই। এবিষয়ে তিনি অক্ষয় মনুষ্যত্বের আধার ছিলেন। 'আত্মানং বিদ্ধি'—'আপনাকে জান' এই মন্ত্রই তাঁহার মধ্যে অহরহ ক্রীড়া করিয়াছে। তাঁহাকে ব্রহ্মবাদী হিন্দু বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয়।

ধর্ম্মের নামে যে সকল হীন অত্যাচার ইউরোপের মধ্যযুগে Spanish Inquisition প্রভৃতিতে দেখিতে পাই, জেহাদ বা ধর্ম্মযুদ্ধে দেখিতে পাই—সেই মনোবৃত্তি পণ্ডিত মহাশয়ের শুধু প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয় একান্ত বিস্ময়ের বস্তু ছিল। মার্টিন লুথার হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের অনেক ধর্ম্মবীরের লেখায় প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কটূক্তি-বর্ষণ দেখা যায়, অপরের ধর্ম্মমতকে হীন করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয় অথচ পণ্ডিত ভুবনমোহনের ধর্ম্মবিশ্বাস খুব জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও তিনি এধার দিয়া যান নাই। তিনি চিরদিনই অনুসন্ধান করিয়াছেন ইন্দ্রিয়াতীতকে শাশ্বতকে ভাবে এবং ধ্যানে। তাই তো পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগের কাছে গৌরবের অর্ঘ্য লাভ করিয়াছেন।

আমি আপনাদিগকে এইটুকু মাত্র জানাইতে চাই যে, পণ্ডিত মহাশয়ের যে বিশেষত্ব তাহা ভারতেরই বিশেষত্ব—যুগে যুগে কবীর, নানক, তুকারাম, মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল এবং যাহা কালে কালে নব নব উজ্জ্বল নামে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে, তাহাই আজ এই ঋষিকল্প মহাপুরুষের মধ্যে মূর্ত্তি ধরিয়াছিল—যে মহাপুরুষ বাংলার কাছে দিনাজপুরের দান এবং ভারতের কাছে বাংলার দান।

ভারত-তত্ত্ব-বিশারদ আচার্য্য সিলভাঁ লেভি রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া বলিতে পারি যে ভারতীয় পুনর্জ্জন্মবাদ স্বীকার বা অস্বীকার করা লোকের স্বেচ্ছাধীন; কিন্তু ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মহাজাতির একটি আত্মা থাকে এবং তাহাই তাহার মহাপুরুষদের রূপ ধরিয়া যুগে যুগে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়া চলে। পণ্ডিত মহাশয়ের ভিতরে ভারতবর্ষের সেই আত্মাই মূর্ত্ত হইয়াছিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের জীবন-ইতিহাসের পরিণাম আমাদিগের কাছে অত্যন্ত শোকাবহ ঠেকে। যে নদী সমুদ্রে যাইবে বলিয়া অভ্রভেদী পর্ব্বতের পবিত্র শুভ্র শিখর হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল সে যখন পথের মধ্যে বালুকারাশির অভ্যন্তরে তাহার গতি হারায় গান ভুলিয়া যায় তখন সেই ব্যর্থতা যেমন শোচনীয়, তেমনি ভক্তের হৃদয় হইতে যে শুভ্র নির্ম্মল ধারা দেশকে পবিত্র ও উর্ব্বর করিতে বাহির হইয়াছিল তাহা যখন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মহৎ কাজে আবদ্ধ হইয়া পড়িল তখন মানুষ ইহার মধ্যে সত্যকার গৌরব বা আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। বস্তুত অক্লান্তহৃদয়ে দিনের পর দিন হোমিওপ্যাথি ঔষধ ব্যাধিক্লিষ্টকে বিতরণ করিয়া দরিদ্রনারায়ণের সেবাকে আমরা ছোট কাজ বলি না। তাহাও অতি মহৎ কাজ। কিন্তু ইহা অপেক্ষা মহত্তর কাজের জন্য পণ্ডিত মহাশয় জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপ এই যে সেই মহত্তর কাজ আমরা তাঁহার কাছে চাই নাই। কখনও কেহ বলে নাই, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ঈশোপনিষদের ব্যাখ্যা করুন আমরা শুনিব—কেহ বলে নাই আপনি সংহিতা পড়ুন—আপনি আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে কিছু বলুন আমরা শুনিতে চাই"—এক কথায় আমরা পণ্ডিত ভুবনমোহনকে জ্ঞানী ভুবনমোহনকে, ব্রহ্মবিদ্ ভুবনমোহনকে চাই নাই, আমরা চাহিয়াছিলাম কামধেনু অথবা কপিলা গাভী যিনি অজস্রধারায় দুগ্ধ জোগাইবেন আমরা দোহন করিব। বস্তুত করিয়াছিলামও তাই। দিন নাই, রাত্রি নাই, তাঁহাকে গৃহে ডাকিয়াছি, তাঁহার দুঃখ-কষ্টের দিকে ফিরিয়াও তাকাই নাই। শ্রীবৎস যখন কাঠুরিয়ার দলে ছিলেন সেটি রাজচক্রবর্ত্তী শ্রীবৎসের যথার্থ রূপ নয়—বিরাটগৃহে নৃত্যগীতপটিয়সী বৃহন্নলার রূপও গাণ্ডীবী অর্জ্জুনের যথার্থ রূপ নয়। ঔষধহস্তে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের রূপও পণ্ডিতমহাশয়ের যথার্থ রূপ নয়। চন্দনকে নিত্যকার জ্বালানি কাঠরূপে আমরা ব্যবহার করিয়াছি।

মহত্তম যে দান সেই জ্ঞানদানের জন্যই পণ্ডিত মহাশয় প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু দানগ্রহণের লোকের অভাব ছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে একবার তিনি গীতাসভা করিয়া এই নগরের জনকতক যুবককে গীতার সারমর্ম্ম বুঝাইতেন; অমনি তখন একদল চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল "পণ্ডিতমহাশয় ছেলেদের ব্রাহ্ম করিবার চেষ্টায় আছেন"—সেইজন্য তাঁহাকে এই চেষ্টায় বিরত হইতে হয়। বেদনার এই ছোট ইতিহাসটুকু যখন তিনি বলিতেন তখন তাঁহার চক্ষুদুটি সজল হইয়া উঠিত। তিনি আজ আট বৎসর আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত অনুত্তেজিতচিত্তে যখন তাঁহার কথা ভাবি তখন এই ক্ষুদ্র সত্যটুকু বার বার মনের কোণে উঁকি মারে যে, পণ্ডিত মহাশয় যদি গীতা বুঝাইয়া ব্রাহ্মই কাহাকেও করিতেন তাহা হইলেও হয় ত বা সে কিছু হইত,—যদিও আমি নিশ্চয় জানি ছেলেধরা বৃত্তি তাঁহার মধ্যে ছিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আশু প্রয়োজনের জন্য আমরা তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার সাজাইয়া নিজের শ্রেয়কে নষ্ট করিয়াছি এবং পণ্ডিত মহাশয়ের যথার্থ রূপটি দেখিতে পাই নাই। এই অদূরদর্শী লুব্ধতার তাড়নায় সকল সমাজেই মনুষ্যবলি চলিতেছে। নররক্তপিপাসু অপদেবতা এই বলি গ্রহণ করে; সে কখনো সমাজ, কখনো রাষ্ট্র, কখনো ধর্ম্ম এবং কখনো তৎকালপ্রচলিত কোনও একটা সর্ব্বজন-মোহকর নাম ধরিয়া মানুষকে নষ্ট করিয়া থাকে।

পণ্ডিতমহাশয় দরিদ্র ছিলেন; কিন্তু যে শক্তিতে মানুষ প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া দুঃখকে অবজ্ঞা করিয়া নমস্য হইতে পারে, তাহা এই ক্ষুদ্র নগরের অকিঞ্চন তাপসই সঞ্চার করিতে পারিতেন। কিন্তু সে দীক্ষা আমরা তাঁহার কাছে লই নাই, এইখানেই আমাদিগের মঙ্গলবুদ্ধি পরাস্ত হইয়াছে। স্ফুলিঙ্গকে শিখা করিয়া তুলিতে হইলে কেবল প্রবল শক্তিতে চকমকি ঠুকিলেই হয় না, উপযুক্ত পলিতারও আবশ্যক হয়। আমাদিগের দেশে বার বার ইহাই দেখা গিয়াছে যে, এখানে শক্তির উদ্ভব হয় কিন্তু তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। মহাপুরুষেরা আসেন, চলিয়া যান; তাঁহাদিগের আবির্ভাবকে ধারণ করিয়া পালন করিবার, তাহাকে পরিণত করিবার স্বাভাবিক সুযোগ এখানে নাই। এই জন্যই মহৎ চেষ্টা বৃহৎ চেষ্টা হইয়া উঠে না, এবং মহাপুরুষ দেশের সর্ব্বসাধারণের অক্ষমতাকে সমুজ্জ্বলভাবে সপ্রমাণ করিয়া নির্ব্বাণলাভ করেন।

পণ্ডিত মহাশয় আজীবন কুমার ছিলেন। কেন ছিলেন, এ প্রশ্ন বহুবার আমাদিগের মনে হইয়াছে। বহু বৎসর আগে আমরা আমাদিগের 'সারস্বত সমিতি'র অধিবেশন উপলক্ষে একবার পণ্ডিত মহাশয়ের বক্তৃতার বিষয় দিয়াছিলাম "বিবাহ ও গার্হস্থ্যাশ্রম"—শুধু এই মনে করিয়া যে বক্তৃতার সময় এই তাপসের মুখে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কোনও কথা বাহির হইয়া পড়িতেও পারে। আমাদিগের মনে আছে তিনি সাধারণের পক্ষে 'বিবাহ ও গার্হস্থ্যাশ্রম'ই প্রশস্ত পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ইহাকে উপেক্ষা করা অনেক ক্ষেত্রে ভীরুতারই পরিচায়ক এইরূপ তিনি বলিয়াছিলেন; কিন্তু সেই সঙ্গে একটি কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন 'যাঁহাকে ভগবান তাঁহার সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে টানিয়া লইয়া বিবাহ করিতে দেন নাই—তাঁহার কথা স্বতন্ত্র।'

পণ্ডিত মহাশয়ের উপর তাঁহার আত্মীয়কুটুম্ব অবিচার করিয়াছে,—আমরা তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছি। বিদ্যাসাগরের বিশেষত্ববর্ণনায় কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি পণ্ডিত মাহাশয়ের উপরেই খাটে। পণ্ডিত মহাশয় যেন এই সহরে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সহোদর কেহ ছিল না, কারণ তিনি সর্ব্ববিষয়ে আমাদিগের বিপরীত ছিলেন। বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে সুদূর নির্জ্জনে উত্থান করিয়া তাপিতকে ছায়া ও ক্ষুধিতকে ফলদান করে, তিনি সেইরূপ পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা ছাড়াইয়া আমাদিগের শিরোরূঢ় হইয়াছিলেন। গিরিশৃঙ্গের দেবদারুদ্রুম যেমন প্রাণঘাতী হিমানীবৃষ্টি সহ্য করিয়াও নিজের আভ্যন্তরীণ সরসতার দ্বারা প্রচুর শাখাপল্লবে পরিণত হয়, তেমনি এই মহাপুরুষ কায়স্থতায় তাঁহার জন্মদারিদ্র্য এবং শতপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়া গৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারি না। এই ক্ষুদ্র হৃদয়হীন, কর্ম্মহীন, দাম্ভিক তার্কিক জাতির প্রতি তাঁহার এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।

পণ্ডিত মহাশয়ের সম্বন্ধে এমন দু'একটি বিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়াছি যাহাতে ব্যথা পাইয়াছি। একটি এই যে তাঁহার নাকি অত্যধিক ইংরেজ-প্রীতি ছিল। কিন্তু বহুদিন তাঁহার সাহচর্য্যে কাটাইয়াছি বলিয়া ইহা জানিয়াছি যে ইংরেজ-চরিত্রের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়চিত্ততা প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রামের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা, এই গুণগুলিকে তিনি অভিনন্দিত করিতেন। বিদেশী বলিয়াই তাহাকে ঘৃণা করিতে হইবে এই আত্মঘাতী মতবাদ তিনি পোষণ করিতেন না। মুসলমানরাজত্বে অত্যাচার অবিচার খুব হইত এ বিশ্বাস তিনি পোষণ করিতেন সত্য, কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে তিনি যে সময় শিক্ষার্থী ছিলেন তখন এখনকার ন্যায় ঐতিহাসিক গবেষণালব্ধ নূতন নূতন তথ্যে ইতিহাসের ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল না। শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায় অথবা বিলাতী-সিভিলিয়ান যে উপাদানে ইতিহাস লিখিতেন, সে উপাদান আজ হাস্যরসেরই উদ্রেক করে। তাঁহারা লিখিতেন সিরাজউদ্দৌলা নৌকাপূর্ণ নরনারী ডুবাইয়া মজা দেখিতেন, জাহাঙ্গীর অকর্ম্মণ্য নরপতি ছিলেন ইত্যাদি। আর বরেন্দ্র-অনুসন্ধানসমিতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকারী অধ্যাপকগণ, পুণা ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সমিতি প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের স্বাধীন অনুসন্ধানের ফলে ইতিহাসের ক্ষেত্র দেশে নূতন আলোকসম্পাত ঘটিয়াছে। ইহাতে অনেক ঝাপ্সা হিসাব সুস্পষ্ট ও লক্ষ্যীভূত হইয়াছে। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয়ের বিশ্বাস তাঁহার সত্যকার জ্ঞান-বিশ্বাসেরই ফল বলিয়া মনে করিতে হইবে; নহিলে পণ্ডিত মহাশয়ের দেশপ্রীতি কাহারও অপেক্ষা কম ছিল বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই।

আর একটি কথা। ধনীকে ধনশালী বলিয়াই তিনি উপেক্ষা করিতেন না। ধনবত্তাই দোষ নহে, দারিদ্র্যও সর্ব্বসময়ে অপরাধ নহে, ইহা তিনি জানিতেন। নিত্যই দেখিতে পাই যে দরিদ্রের সাহায্যকারী সহজেই লোকের শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার উপর সে যদি ধনীর সহিত কারণে অকারণে দুর্ব্যবহার করে, সময় অসময় খটকা বাধায় তাহা হইলে 'স্বাধীনচেতা' প্রভৃতি অলীক ও অপ্রকৃত বিশেষণে অভিহিত হয়। পণ্ডিত মহাশয়ের এই দুর্ব্বলতা ছিল না।

পণ্ডিত মহাশয় হাস্যরসিক ছিলেন। উত্তরবঙ্গের কথা যাহাকে আমরা "বাহের কথা" বলি, তাহা তিনি এমন সহজ ও সুন্দরভাবে উচ্চারণ করিতেন যে তাহা অনাবিল হাসির তরঙ্গ তুলিত। হাসিতে পারা হৃদয়বত্তার পরিচায়ক। দুঃখভারপীড়িত বাঙ্গালী আজ হাসিতে পারে না।

তিনি একাহারী ও নিরামিষাশী ছিলেন ইহা আপনারা জানেন। অপরিচিত কেহ নিমন্ত্রণ করিলে কখনও কখনও বলিয়া দিতেন "বাবা, আমি কিন্তু ভাত কিছু বেশী খাই"—তাঁহার এই শিশুর ন্যায় সরলতা সত্যই সকলকে মুগ্ধ করিত। কাহারও ব্যবহারে তাঁহার যখন অত্যন্ত দুঃখ বা ক্রোধের কারণ হইত, তখন তিনি বলিতেন 'তুমি দুর্ব্বিনীত'—ইহাই তাঁহার চরম কটূক্তি। ইহার বেশী তিনি বলিতে পারিতেন না।